অন্ধ-প্রেম

শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক :
শ্রীমতী গৌরী চক্রবর্ত্তী
প্রযত্নে—শ্রীশ্যামল কুমার ভট্টাচার্য
১২, কালীদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম-প্রকাশ : ৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার, মহালয়া ১৩৫৪ সন।

প্রচ্ছদ-পট-পরিকল্পনায়—লেখক।
শিল্পী : শ্রীরণজিৎ অধিকারী।
(পলাশী—নদীয়া)

মুদ্রাকর :
শ্রীকান্ত বসাক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১ বি, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা—৯

উপহার ঃ

মুখবন্ধে ঃ

ভূমিকা (Introduction or role) বা অবতারণা কোন বিষয় বা গ্রন্থ আলোচনার পূর্ব-পাঠ বা সোপান। কারণ—"ক্রম্ করে রাজা আসিং" যেমন বেমানান তেমন উপস্থাপনা নয়।

তাই অন্ধ-প্রেম গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে প্রেম-অন্ধ, না—অন্ধের প্রেম। আমরা সবদিক বিচার করে প্রথমটাকেই সিদ্ধান্তে ধরে নেব —প্রেমই অন্ধ। কারণ প্রেমে অন্ধ না হ'লে 'প্রেম' বলতে যা বোঝায় তা হয় না।

প্রেম স্বকাম। 'কামনা বা 'বাসনা'ই প্রেমের মহামিলনের বা সৃষ্টির মহতি উৎস। তাই 'কামনা' বা 'বাসনা' না থাকলে ত্যাগের মহতি-মহিমা বা সৃষ্টির মহতি আনন্দ উপলব্ধি হয় না। এই 'কামনা' বা 'বাসনা' সুদূর অতীতে "নিরগুণ-ব্রহ্মের" অন্তরে অঙ্কুরিত হয়েছিল—, "এক মেহং, বহুশ্যাং প্রজায়তে।" তাই 'নিঃক্রিয়' বা 'নিঃগুর্ণ-ব্রহ্মকে' স্বঃগুণ-ব্রহ্ম' হয়ে হ'তে হয়েছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আনন্দে আনন্দময়।

এই অন্ধ-প্রেমই একদিন সুদূর অতীতে দ্বাপরে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম মিলনের কোন সম্পর্ক বাধা হয়ে ভক্তজনের মনে বিরূপ মনভাবের সৃষ্টি করে নি। বরঞ্চ— প্রেমের কষ্টি-পাথর বলতে রাধা প্রেমই বৈষ্ণবগণের 'পরকিয়া' পরম প্রেম বলে বিবেচিত।

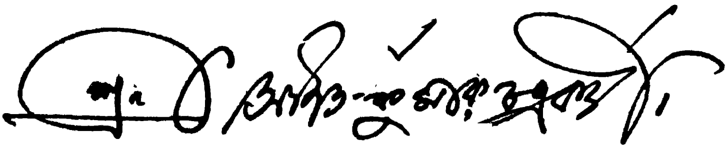
এই অন্ধ-প্রেমই চণ্ডিদাসের রজকিনী রামীর মিলনে কোন জাত-পাতের বাধা, মিলনের অন্তরায় হয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। এই অন্ধ-প্রেমই একদিন লায়লা-মজনুকে মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বলে মনে করিয়েছিল। তাই তাঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেছে—তবুও প্রেমকে অস্বীকার করেনি।

এই অন্ধ-প্রেমই একদিন ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন, রাজকুমার অষ্টম-এডুয়ার্ডের কাছে তুচ্ছ মনে করিয়েছিল, রাজসিংহাসন ছাড়তে চেয়েছেন—তবুও তাঁর প্রেয়সী ওয়ালিস সিম্পসনকে ত্যাগ করেন নি।

তাই বলছিলাম প্রেমই অন্ধ। যদি উপায় ও অপায়ের সংসার-সমাজের লাভ

লোকসানের বেনেতি বিচার করা হয়, তবে সে প্রেমের-মহিমা, ত্যাগের-মহত্ত্বতা ও আদর্শের অনুপ্রেরণা সে প্রেমে রূপায়িত হ'তে পারে না।

এই প্রেম-মিলনের ত্যাগের মহতি আদর্শ 'অন্ধ-প্রেম' গল্পের নায়িকা 'সুলেখা' নায়ক 'জ্যোতির' অন্ধচোখে এনে দিয়েছিল বিশ্বের রূপ রসাস্বাদনের পরশ-মণির ছোঁয়া। এবং 'সুলেখার' চোখ দিয়ে নায়ক—'জ্যোতি' দেখেছিল সুলেখা কত সুন্দর; সুলেখা কত মহৎ, সুলেখা কত বড়।



ভাদ্র মাস। ভরা গাং। দামোদর তার দু-কূল ছাপিয়ে তরতর বেগে বয়ে চলেছে। তখনো দামোদরের বুকে বাধার সেতু হয়নি। পারা-পার খেয়া নৌকাতে হতে হয়। তবে খেয়া-পার হওয়া বা পার করা কোনটাই নির্বিঘ্নে নয়। নৌকার হালি ও দাঁড়ীকে হিম্‌সিম্ খেতে হয়। গাজিপুর-ন পাড়ার সুধন্য ধাড়ার বড় ছেলে 'সোনাই' আজ দুর্গাপুর হ'তে বাড়ী ফিরছে, দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে। তাও দেশে ভয়াবহ বন্যা ও বুড়ো বাপের শেষ অবস্থার খবর পেয়ে। যদিও সে বাপের উপর রাগ করেই বিদেশে কাজ করতে বেরিয়েছিল, তবুও দেশে পা দিতেই তার মনটা দেশের ও বাপ-মা, ভাই-বোনেদের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছর বাদে দেশে পা দেওয়ার ফলে তার অতি পরিচিত আমতাঘাটের সেই বটতলা ও ভাদরের ভরা দামোদর ও ওপারের বেতাই-এর পাড় দেখতে ভালই লাগছে। মনে হচ্ছে—তারা কত পাল্টেছে—কত নতুন!

হঠাৎ তার কানে এল, ''বলহরি, হরিবোল'। সোনাই-এর ভিতরটা হঠাৎ যেন 'ছ্যাৎ' করে উঠল। মনে পড়ে গেল রাগ করে চলে আসার সময় বুড়ো-মা-বাপের মলিন মুখখানা। তাই ব্যাগ্রভাবে নৌকার হালি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল,—"বিশু কাকা! কার কি হ'ল গো?

বিশু মাঝি—, "ওঃ! সোনাই না!"

সোনাই—, "হাঁ—কাকা, আমি।"

বিশু মাঝি—, "তা, কবে দেশে ফিরলি?"

সোনাই—, ''এই যে এইমাত্র আসচি।"

বিশু মাঝি—, "তা বেশ, তা বেশ, তবে বাপ-মার উপর রাগ করতি হয়? বাপ-মা কিনা সাক্ষাৎ গুরু। দাঁত থাকতি দাঁতের মর্যাদা কেউ বোঝে না গো! আর যাঁর নেই তার ত কথাই নেই। তা তোমার কোন ভয় নেই, শিগ্রি বাড়ী-পানি যাও, তোমার বাপেরও

অবস্থা ভাল নয়, বলেই একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বল্ল—, "অভাগা যেদিকি চায় সাগর শুকিয়ে যায়। আজ ছোঁড়াটার কি আবস্তা, বাপ-মা মরা ছেলে—, যদিও একটা হিল্লি হ'ল—তাও ভগবানের সজ্য হ'লনি। একে তো অন্ধ তাতে তিন কুলে কেউ নেই যে ছুটো ভিক্ষের চাল ফুটিয়ে দেবে।"

দামোদরের পশ্চিম পাড়ে পার-ঘাটের কিছু দূরে একটা শবদাহ হচ্ছে, কিছু লোক খোল-করতালি নিয়ে হরি-নাম করছে, আর ক'জনে মিলে চিলুতে কাঠ ঠিক্ করে দিচ্ছে; আর মাঝে মাঝে, "বল-হরি, হরি-বোল," বলে হরি-ধ্বনি দিচ্ছে। তারই অনতি দূরে আঠেরো-ঊনিশ বৎসরের সুঠাম বেশ উজ্জ্বল বর্ণের ঝাঁকড়া-চুল, বলিষ্ঠ দেহের একটি যুবক অবুঝ শিশুর মত গড়া-গড়ি দিয়ে কাঁদছে। তার দিকে আর কেউ বিশেষ লক্ষ্য করছে না। সেদিকে নজর পড়তেই সোনাই বলে উঠল—, "আহা! ছেলেটাকে কেউ ধরছে না! ছেলেটার বাবা বুঝি!"

বিশু মাঝি—, "আঁ,·······বাবাই বটে, তবে ধর্ম বাপ। বাপের চাইতেও বড়। কেন গা, তোমাদের ন-পাড়া গাজিপুরের তিনকড়ির ছেলেকে চেন না?'

সোনাই বিস্ময়ে উত্তর দিল—, 'ওঃ হাঁ-হাঁ চিনি বৈকি! তিনকড়ি খুড়োর একমাত্র ছেলে—জ্যোতি সামন্ত। তা ছেলেটাকে চেনা চেনা লাগছিল বটে। ও হাঁ কাকা! ও এখানে অমন করে আছড়ে পিছড়ে কাঁদছে কেন? ও তো লেখা-পড়ায় বেশ ভাল ছেলে ছিল ছোটবেলা হতেই।"

. বিশু মাঝি—, "ওঃ তুমি জাননি বুঝি? তা জানবেই বা কি করে? তুমি তো পাঁচ বছর দেশ ছাড়া। তবে-শোন"—বলে বিশু মাঝি সংক্ষেপে বলতে লাগল—, "তোমাদের গাজিপুরের তিনকড়ি সামন্তের ছেলেটা দেখতে শুনতে সুপুরুষ, লেখাপড়াতেও বেশ ভাল ছ্যালো। শুনেছি সাত কেলাস পর্য্যন্ত পড়েছে। বছর বছর প্রথম

হতো। আট কেলাস যখন পড়ে তখন মায়ের দয়া হয়ে চোখ ছুটোই যায়। মায়ের জন্য অবশ্য চোখ ছুটো পুরো যায়নি। চোখে বলে ঝাপসা দেখছিল, ওর মা পাড়ার কার কথায় কি গাছের পাতার রস দিয়ে চোখ ছুটো জন্মের মতন গেল। আর তার পরের বছর একদিন আগু পেছু ওর বাপ-মা ভেদ বমিতে গেল। এই খবর পেয়ে আমাদের বেতাই এর কেষ্ট যাত্রার গানের মাষ্টার, বিপিন অধিকারী গিয়ে অন্ধ জ্যোতিকে এনে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগল, ও গান বাজনা শিখাতে লাগল।''

সোনাই বিশু মাঝির কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বল্ল—, "আচ্ছা কাকা, ওর তো জ্যাঠা কাকা আছে।''

বিশু মাঝি—, "আছে তো বটে, তাদেরই দিন চলে না. তার উপর সক্ষম ছেলেকেই মাউড়া হ'লি ভাত দেয় না—ঃ তাতি অন্ধকে ভাত দেবে ? জ্যেঠি-কাকী যুতের লয় গো, যুতের লয়! আর বিপিন অধিকারী ওর বাবার বাল্য-বন্ধু ছ্যালো। অধিকারী মাষ্টারের বৌ-ছেলে ছ্যালো নি, বে·······এ একবার হয়ে ছ্যালো বটে তা ছেলে-পুলে না হ'তিই বৌটা সাপে কেটে মারা যায়। আর বে-থা করেনি। গান বাজনা নিয়েই দিন কাটাত। ছেলেটার মা-বাবা মারা যাবার পর তার খোয়ার শুনে অধিকারী মাষ্টার জ্যোতির তের বছর বয়সে নিয়ে আসে। নিজে রেঁধে খায়াতো, আর গান বাজনার তালিম দিত। কেষ্ট যাত্রার দলে আসরে বসে গান গাইত। বেশ গলা! তাইতো বলি ভগবানের বিচার নেই গো! যাকে মারে—, হাতেও মারে—, পাতেও মারে। তাই ত অমন করে ছেলাটা কাঁদছে। অধিকারী মাষ্টার—তার মা-বাপ দুই-ই ছ্যালো। অধিকারী অভাবে কে তাকে দেখবে ? কে তাকে খাওয়াবে? অধিকারী তার নিজের ভিটেটো জ্যোতির নামে লিখে দিয়ে গিয়েছে। অধিকারী মাষ্টার জ্যোতির নিজের জ্যাঠা-কাকার চাইতি অনেক বড় ছ্যালো।" দেখতে দেখতে বেতাই-এর ঘাটে নৌকা এসে লাগল। মাঝিরা হাঁক্—

পাড়ছে—, "সাবধান, নাউ ঘাটে লাগুক—আগে। কেউ ঝাঁপ দিওনি।"

বিশু মাঝি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বল্ল—, আমাদের কাজ শুধু এপার ওপার করা, তবুও মাঝে মধ্যি কিছু কিছু ব্যাপার-স্যাপার মনে বড় ঘা-লাগে, দাগ কাটে। আমরাও একদিন পারানি বন্ধ করে পাড়ি দেব।" বলেই বিশু মাঝি আবার একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বল্ল—"যে মারে সেই—ধরে—আমরা ভেবে করব কি?"

সোনাই বিশু মাঝির কাছে সব শুনে মনটা ভারাক্রান্ত অবস্থায় তার বাড়ী ন-পাড়া গাজীপুরের দিকে রওনা হ'ল। মনে মনে আশংকা করতে লাগল—, আমি আবার বাড়ী গিয়ে সব ভাল দেখব তো!

বেতাই-এর কেষ্ট যাত্রার গানের মাষ্টার বিপিন অধিকারীর শ্রাদ্ধ-শান্তি তাঁর দলের আর পাঁচজনে চাঁদা-তুলে তার দত্তক পুত্র অন্ধ জ্যোতিকে দিয়েই পনেরো দিনের মাথায় করাল। কথায় বলে—নিত্যি রোগ দেখে কে? আর নিত্যি অভাব মেটায় কে? হ'লোও তাই। গানের আসর প্রায় ভেঙ্গে গিয়েছে? একে তো মাষ্টার নেই—, তার উপর কে কাকে মানে! আর নিজ নিজ কাজ নিয়ে সবাই ব্যস্ত। তার উপর অন্ততঃ একজন উদ্যোগী আগ্রহী লোকের দরকার। সেই লোকের অভাবে তৈরী গানের দল আজ ভেঙ্গে গেল। জ্যোতির অবস্থা সঙ্গীন। কারণ অধিকারী মাষ্টার মারা গিয়েছেন আজ প্রায় মাসখানেক হ'ল। জ্যোতির দিন আর চলে না। একটু মুড়ি-চিড়ে খেয়ে আর ক'দিন চলে? আর তাই বা তাকে রোজ রোজ কে দিচ্ছে! আজ দু-দিন জ্যোতি অনাহারে মনের দুঃখে বেতাই ঘাটের বটতলায় হাতড়ে হাতড়ে এসে বসে আপন মনে গাছে হেলান দিয়ে—চোখ বুজে গান গাইতে লাগল—,

ভৈরবী মিশ্র

"মায়ার বাঁধনে বাঁধিলিয়ে মোরে—,
আজি কোথা ওগো চলে যাও ভুলে;

নয়নের জলে ডাকি কত তোমারে—,
বারেক আসিয়া নাও না কোলে তুলে।”

জ্যোতির চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, পারের পথচারীরা থমকে দাঁড়িয়ে গান শুনে কেউ মুগ্ধ, কেউ বা দয়াপরবশ হয়ে তার সামনে টুপটাপ করে দু-চার পয়সা ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। বেশ কিছু পয়সা পড়তে লাগল। কিন্তু জ্যোতির সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। পারের কত লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে—, গান শেষ হলে জ্যোতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। লোকজন চলে যেতে জ্যোতি আপন মনে বটগাছটায় হেলান দিয়ে ভাবছে—, সে কি করবে! কোথায় যাবে?

এমন সময় স্কুলের ছেলে মেয়েরা হৈ হৈ করতে করতে পার ঘাটে এসে ভিড় করতে লাগল। তারা ওপারে আমতার হাইস্কুলে যাবে। একটা নয় দশ বৎসরের দুষ্টু ছেলে এসে জ্যোতির সামনে ছড়ান-ছিটান পয়সাগুলো কুড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে—, একটা তের-চোদ্দ বৎসরের স্কুল বালিকা ছুটে এসে ছেলেটার গালে 'ঠাস্' করে সজোরে এক চড় মেড়ে পয়সাগুলো কেড়ে নিতে ছেলেটা ছুটে পালিয়ে গেল। তখন মেয়েটি জ্যোতিকে লক্ষ্য করে বলছে—, “তুমি কি? তোমার পয়সাগুলো ছড়িয়ে পড়ে, আর অন্যে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে—চোখেও দেখছো না?” বলে—' জ্যোতির হাতে পয়সাগুলো দিল—“নাও।” জ্যোতির এতক্ষণে চিন্তার চমক্ ভাঙ্‌লো। সে বল্ল—, না ভাই! আমি চোখে দেখি না। আমার পয়সা! আমায় লোকে পয়সা দিয়েছে বুঝি?”

মেয়েটি জ্যোতিকে—“চোখে দেখতে পাও না—”বলে নিজেই ব্যথা পেল।—

“কিছু মনে করো না, আমি জানতাম না যে, তুমি চোখে দেখ না। এই পয়সাগুলো নিশ্চয় তোমার। তুমি কি গান করছিলে?’

জ্যোতি— “হ্যাঁ, আমি তো কোনদিন রাস্তায় বসে গান করিনি,

আজ মনটা বড় খারাপ তাই—' ''কথা শেষ না হ'তেই মেয়েটি আবার বল্ল—, 'তাহ'লে নিশ্চয় তোমার গান শুনে লোকে মুগ্ধ হয়ে পয়সাগুলো দিয়েছে—, "হাত ধরে, "নাও'' বলে তার পারের খেয়া ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে এবং সঙ্গের সঙ্গীরাও চলে গিয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি যেতে যেতে বল্ল—, "আবার আমি আসব।'' জ্যোতি মেয়েটির সহানুভূতির ও ছোঁয়ায় ভাবতে লাগল—, "কত মমতা, কত সহানুভূতি, ভগবান আছেন! মানুষকে ভগবান মানুষের মধ্য দিয়েই দেখান।

এইভাবে বসে থাকতে থাকতে পারের খেয়া আবার এ পাড়ে এসে ঘাটে লাগল, বিশু মাঝি নৌকা ছেড়ে উপরে উঠে জ্যোতিকে একটা পাউরুটী ও একটা মাটির ভাঁড়ে চা এনে সামনে ধরে বল্ল—, "লে, খা, চা খা, ভাবছিস কেন? যাঁর কেউ নেই ভগবানই তাকে ত্যাখেরে! যে অরি—, সেই বিষহরি। এই ত্যাখ কত পয়সা পেয়েছিস্, ওখানে পড়ে কেন? এমনি করে রোজ সকালে ঘাটে এই গাছতলায় এসে একটা থলে পেতে বসবি। হ্যা—, তোর তো বাঁয়া আছে, বাঁয়াটা এনে বাজিয়ে গান করবি। তোর পয়সায় তুই খাবি। আর না পারিস্, আমি তোর বাঁয়াটা থলেটা এনে দেব। ভাবচিস্ কেনে? নে, নে, চা-টা খেয়ে নিয়ে আজ ঘরে ফিরে যা।"

জ্যোতি "হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে—বল্ল—, "কাকা, আমি যে পথের ভিখারী হলাম। এ আমার কি হ'ল?''

বিশু মাঝি মাথায় হাত বুলিয়ে বল্ল—"তুই দুঃখ করচিস্ কেনে? ভগবান তোর এমন মিষ্টি গলা, কত মিষ্টি তবলায় হাত দিয়েছেন। এটাও তাঁর দয়া জানবি। তুই তো চোর হোস্‌নি, ছ্যাচোর হোস্‌নি! যা-যা, বাড়ী যা, মানুষই ভগবান। মানুষের মধ্যে দিয়ে ভগবান মানুষকে ত্যাখেরে। ভাবচিস্ কেনে! আমার খেয়া ছাড়বে আমি দাঁড়াতি পারলাম নি। যা-যা—, বাড়ী যা।''

জ্যোতির মনে আশার আলো দেখা দিল, লাঠি দিয়ে ঠুক্‌তে

ঠুক্‌তে তার ঘরে যেতে যেতে ভাবতে লাগল—"তাই তো, যার কেউ নেই ঈশ্বর তাকে দেখেন, যে ভাবে হোক। আমি তো চুরি করছি না! না হয় পথের ধারে বসে গান শুনিয়ে পেটের দায়ে রোজগার করব। গায়করাত আসরে বসে গান করেও পয়সা নেয়—; আমি না হয় রাস্তায় বসব। তফাৎ পথ-ঘাট, আর আসর। মানুষ যেখানে মিলিত হয় সেটাই'ত আসর।" —আবার ভাবতে খারাপ লাগছে, মনে পড়ছে—, সেও একদিন স্কুলে যেত কত উৎসাহ নিয়ে, বৎসর বৎসর সে ক্লাসে প্রথম হ'ত। আজ........? তার এ কি হ'ল? এও কি কপাল! যাকে বলে পথের ভিখারী। ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

জ্যোতি তার পরের দিন বাইরে বেরল না, একে'ত ঘাটের ধারে রাস্তার উপর গাছের তলায় বসে গান শুনিয়ে পয়সা উপায় করতে তার মন কিছুতে সায় দিচ্ছে না। কিন্তু উপায়ও নেই! তাই সে তার ঘরের বারান্দায় বসে আপন মনে ভাবতে লাগল—ভগবান তাকে সত্যি সত্যি পথের ভিখারী অন্ধ গায়ক করল। 'সবই কপাল'—ভেবে আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। গত দিনে নয় সিকা পয়সায় তার পরের দিনটাও কোন রকমে রুটী, মুড়ি, চিড়েতে চল্ল! কিন্তু পরের দিন?

পরের দিন ঠিক দশটার সময় অন্যান্য আর পাঁচটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে স্কুলে যাবার পথে ঘাটে এসে যে যার পার ঘাটে নেমে গেল। সুলেখা কেবল একা ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক নজর করতে লাগল—অনুসন্ধানী চোখে, "কোথায় গেল কালকের অন্ধ ছেলেটা? আজ কি সে গান করতে তবে আসেনি! তার কে আছে? কেনই বা পথে বসে গান করতে বেরিয়েছিল! আহা! কত কষ্ট। কেন ভগবান চোখের আলো কেড়ে নেন!" ইত্যাদি—। এমন সময় ঘাটের নিচ হ'তে তার এক সহপাঠী ডাকতে লাগল—, "সুলেখা! ওখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস? আয়, নেমে আয়; খেয়া যে ছাড়বে।

সুলেখা একটু ইতস্ততঃ করে খেয়ায় নেবে এল। সহপাঠী সুনিতা—, "কিরে! ওখানে অমন করে হাঁ করে কি খুঁজছিলিস, কি হারিয়েছে! সুলেখা—, "কিছু না, কাল যে ছেলেটি ওখানে বসে ছিল সে ত আজ আসেনি!" সুনিতা—, "তাতে তোর কি?" সুলেখা—, "না, কিছু না, ছেলেটি চোখে দেখতে পায় না কিনা! সুনিতা, তা মনে হয় আজ বেরুইনি।" খেয়া ছেড়ে দিল। কথাগুলো হালি বিশু মাঝির কানেও গেল। সে পাল্টা খেয়ায় এসে একেবার উপরে উঠে খোঁজ নিল, 'কই, তাই ত আজও জ্যোতি আসেনি!' ভাবতে লাগল, "গত কাল ওকে এত করে বুঝালাম, আর আজও এল না?" আবার নিজের কাছেই উত্তর পেল, হয়ত আজ তার শরীরটা ভাল নেই। অথবা অভ্যাস নেই তো, সঙ্কোচ ও লজ্জা করছে। যাহোক—বিশু মাঝি এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে আবার তার কাজে নেবে গেল।

দিন দুই বাদে বিশু মাঝি সকালে বিপিন অধিকারীর ঘরের পাশ দিয়ে আসার সময় জ্যোতির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল জ্যোতি ঘরের বারান্দায় একটা তক্তাপোষের উপর চুপচাপ শুয়ে আছে। বিশু মাঝি জিজ্ঞাসা করল—, হারে জ্যোতি! তুই কি ঘুমোচ্ছিস্?" বিশু মাঝির গলা শুনে জ্যোতি তাড়াতাড়ি উঠে বসে বল্ল—, "না কাকা! এমনি শুয়ে আছি।" বিশু মাঝি, "হাঁরে! তোর কি শরীর খারাপ?" জ্যোতি—, "না, কাকা, তবে কিছুই ভাল লাগছে না!"

বিশু মাঝি—, "দুনিয়াটা কারু একতরফা ভাল লাগা, না লাগাতে চলে না রে; সে চলে নিজের নীতিতে, নিজের পথে; আমাদের চলতে হয় তার মতে। আর মানানোর গুণ এত; আজ যা ভাবা যায় না—, কালকেই তা সহজে অভ্যাস মত অতি সহজে হয় রে। দেখ! আমি কি জন্মে ছিলাম মাঝি হয়ে দুনিয়ার লোক পার করতে? না, তা নয়, কি করব, বল! এই দেশের জাতপাত, যোগ্যতার অ-যোগ্যতার মাপকাঠিতে সবকিছুর বলি হয়ে মাঝির ছেলে মাঝি হব এটাই সান্ত্বনা, সারাটা জীবন ধরে পরকে পারই করে গেলাম,

নিজে আর পার হ'লাম না। একটা ছেলেকেও এই নাও ছেড়ে পরপারে আর তুলতে পারলাম না। দুঃখ এখন আর হয় না রে! এখন মনে হয় বেশ আছি উচ্চ আশায়—যন্ত্রণায় আর ছট্‌ফট্‌ করি না। কাউকে ফাঁকি দিই না, যা পাই তাই খাই। ভালমন্দ কত লোকের সঙ্গে মেলামেশা, দেখাশুনা, আর চিরদিনের বন্ধু এই নদী। এ শুধু ডোবায় না, আবার দেয়ও কিছু, তাই তাঁকে মানিয়ে তাঁর বশে চলতে হবে না? মানালেই—মানায়। চ-চ! কই তোর বাঁয়াটা দে আমি লিয়ে যাচ্ছি, আর থলে নিতে হবে না, আমার আছে দেবখোন্। একদিন এ পারে বোসবি, আর একদিন ও পারে বোসবি। তোর পারের ভয় কি? আমি'ত আছি। দেখ, ভাগ্যের সঙ্গে মানিয়ে নে—, এই দুর্ভাগ্যই একদিন তোর বন্ধু হয়ে ভাগ্য খুলে দেবে।"

জ্যোতি—, "কাকা, যাও তুমি, আমি একটু চোখে-মুখে জল দিয়ে লাঠি নিয়ে ঠোকায় ঠোকায় যাচ্ছি।"

বিশু মাঝি—, "বাঁয়াটা তবে দে, আমি যাই তুই আয়" বলে চলে গেল। জ্যোতি আজ প্রথম তার দিনপাতের জন্য পা বাড়াল বেতাই ঘাটের ধারে গান শুনিয়ে রুজি রোজগার করতে। প্রথমে তার গর্ভধারিণী মায়ের কথা মনে পড়ল—গ্রাম্য মেয়েদের কথায় না জেনে বুনো গাছের পাতার রস দিয়ে যখন তার দৃষ্টিশক্তি জন্মের মত গেল—, তখন তাঁর কি কান্না! তিনি কি জানতেন তাঁরই জন্যে আজ এই অন্ধকারে জীবনটা কাটাতে হবে! তবুও মায়ের কথা মনে পড়তে তারও চোখ দিয়ে জল এল; মা ত তার চোখের আলোই ফেরাতে চেয়েছিলেন। তার পর জন্মদাতা, আশ্রয়দাতাকে একই সঙ্গে মনে পড়ল, ভাবল তারই কপালগুণে কেউই বেশী দিন থাকলেন না। তবুও তাঁদের আশীর্বাদ চাইলো।

এইসব ভাবতে ভাবতে জ্যোতি তার লাঠি নিয়ে পায়ে-পায়ে ঠুকতে ঠুকতে ঘাটের ধারে বটতলায় বিছান চটের উপর এসে বসল।

হাতের আন্দাজে টের পেল তার বাঁয়া তবলাও আছে। সে হাততুলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে গান ধরল—।

বেহাগ

"আজি আলোর ভুবনে,
কাননে কাননে
কত না ফুটিল ফুল;
যাহা কাছে পাই সকলি হারাই,
তবুও ভাঙে না মনের ভুল।"

গান শেষ হ'তে না হ'তে বিশু মাঝি চা-বিস্কুট নিয়ে এসে জ্যোতির চোখে জল দেখে। নিজের চোখের জল আর ধরে রাখতে পারল না, ধরা গলায় বলতে লাগল—, "কাঁদছিস্ কেন? কান্না দিয়ে কি কান্নার কপাল মোছা যায় রে বোকা? হাস-হাসি দিয়ে কান্নার কপালকে বিদ্রূপ কর, দেখবি—কান্না আর ঠাঁই পাবে না, জীবনে কান্না তো আছেই, তাকে পাত্তা দিতে নেই। পাত্তা দিলে সে পেয়ে বসে বুঝলি।" বলে চায়ের ভাড় ও বিস্কুট জ্যোতির হাতে ধরিয়ে দিল।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন; কাছে এসে একটা পাঁচ টাকার নোট বিশুর হাতে দিয়ে বল্লেন—, "এটা ওর জন্যে রাখ।" বিশু—, "আজ্ঞে আপনি!' ভদ্রলোক, "আমি এই পথে যাচ্ছিলাম।" বলে চলে গেলেন। ইত্যবসরে স্কুলের ছেলে মেয়েরা এসে জড়ো হ'ল। বিশু বল্ল—, "যা, তোরা খেয়ায় যা, আমি যাচ্ছি।" কেবল সুলেখা কাছে এসে জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করল—, "আচ্ছা তোমার কে আছে?" জ্যোতি—, "কেউ না ভাই এক ঈশ্বর আর তোমরা সকলে, তোমাদের সকলের দয়া ও ভালবাসা আজ আমার পথের সম্বল।" "আচ্ছা তোমায় কি বলে ডাকব?" জ্যোতি একটু হেসে বল্ল—, "আমায় আমার নাম ধরে ডাকবে, আমার নাম শ্রীজ্যোতি সামন্ত।" বলেই আপন মনে আত্মগতভাবে বল্ল—, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। যেমন জ্যোতির কোন

'জ্যোতি' অর্থাৎ আলো নেই।" সুলেখা—, "আহা তা বলছো কেন, সবার জীবনেই আলো আছে।" জ্যোতি—, "বাঃ বেশ তো তোমার কথা, তা তোমায় কি নামে ডাকব ভাই ?" সুলেখা—, "আমার নাম সুলেখা। মনে থাকবে ?" বলেই জ্যোতির হাতে একটা সিকি দিয়ে বল্ল—, "এটায় তুমি চা খেও।" জ্যোতি অতি ব্যগ্রভাবে পয়সা নিয়ে বল্ল—, "না ভাই না, তা হয় না। বোধ হয় তুমি স্কুলে যাচ্ছ।" সুলেখা—, "হ্যাঁ, আমার খেয়া ছেড়ে দেবে আমি চল্লাম তুমি নাও।" জ্যোতি সুলেখার হাতটা ধরে ফেলে অনুনয়ের সুরে বল্ল—, "লক্ষ্মী দিদি ভাই, মনে হয় তোমার টিফিনের পয়সা দিচ্ছ। এই দেখ কে একজন ভদ্রলোক আমায় পাঁচ টাকা দিয়ে গেলেন। বেশী কি দরকার ? ঈশ্বর দিন চালালেই হ'ল। আর তোমরা ত আছোই, আমি চেয়ে নেব। আজ আমার অনুরোধ—আমি তোমায় দিচ্ছি এই 'সিকিটায় তুমি টিফিন করো।' এমন সময় সহপাঠি সুনিতা ডাক দিল—, "কই সুলেখা ! আয় খেয়া যে ছাড়বে !" সুলেখা—, সিকিটা বাধ্য হয়ে নিয়ে বল্ল—, "আজ যাই জ্যোতিদা, কাল সকালে দেখা হবে।" জ্যোতি—, "আচ্ছা এস।" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সুলেখা চলে যেতে ভাবতে লাগল—, 'আহা, কত মায়া—, কত মমতা ! ভগবান ওর ভাল কর।" বলে আবার একটা গান ধরল—,

মিশ্র ইমন্

"শ্যামা তোরে কি কভু পাব না।
ভাবিতে ভাবিতে এদেহ কি যাবে ভাবিলে যে বাড়ে ভাবনা।
সংসারের বিষে হ'য়ে জর্জ্জরিত হারায়েছি দিশে হারায়েছি চিত
ছুটিতেছি মিছে আলেয়ার মত পোড়া চিতে লয়ে কামনা।
কোথা হ'তে আমি ভাবিয়া না পাই কোথায় যাইব পাথেয় যে নাই
মোহ কর নাশ হও মা প্রকাশ চরণে মিশায়ে নাও না।"

গান শেষ হ'তে কয়েক জন বয়স্ক ব্যক্তি, "আহা, বাঃ বেশ, বেশ চমৎকার।" বলে যে যার দু-চার পয়সা দিয়ে গেল। বেলা বেশ বেড়ে যেতে জ্যোতি সে দিনের মত দিনের রুজি উঠিয়ে তার ঘরে ফিরল।

পরদিন সকালে জ্যোতি তার প্রাতঃকৃত সেরে একটু জল খেয়ে লাঠি নিয়ে একটু দেরীতেই ঘাটের ধারে এস বসল। আজ তার পথে বেরুনোর তৃতীয় দিন। নিজের কাছেই তাকে একটু সহজ মনে হচ্ছে। একটু যেন বাইরের জগৎ ও পথ-ঘাটের সঙ্গে তার একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভাবছে—বিশু কাকার কথা—, "মানালেই সব সহজ হয়ে যায়।" এমন সময় বিশু মাঝি কাছে এসে জ্যোতির পিঠে হাত বুলিয়ে বল্ল—, "আজ আবার দেরী করলি কেন রে?" জ্যোতি—, "কাকা' তোমার কথাই ভাবছিলাম।" বিশু—, "কেনরে!" জ্যোতি—, "এই আসা যাওয়াতে পথ-ঘাট অনেকটা চেনা ও আপন-আপন মনে হচ্ছে।" বিশু— "হ্যাঁরে তাই হয়। এলে গেলে কুটুম। মানে—আনা-গোনা, মেলা-মেশাতেই পরও আপন হয়। তা—চা খেয়েচিস্?" জ্যোতি—, "হ্যা খেয়েছি।" বিশু—, "তবুও একটু খা।" বলে একটা ছেলেকে ডেকে চা ও দুখানা বিস্কুট আনিয়ে নিল। জ্যোতি—, "তা—হাঁ কাকা তুমি রোজ রোজ আমাকে এমন করে কত চা-রুটী বিস্কুট খাওয়াবে?" বিশু—, "তাতে কি হয়েছে? খাওয়ালে কি ফুরায়। দেখ একটা পশুরও অন্তরে ভালবাসা আছে। তা না হলে তাদের বংশ রক্ষে পেত না। দেখ বাঘ যত হিংস্র, কিন্তু তাদের সন্তানের প্রতি কত মমতা। আর মানুষ হয়ে, মানুষ-মানুষকে দেখবে না? আর তা যদি না পারে তবে পশুরও অধম হয়ে মানুষের হুঁশটা খারিজ করে নরকে যাক।" কথা কটা শুনে এক বৃদ্ধ পথচারী ভদ্রলোক বল্লেন—, "কথা কটা তোর বড় খাঁটি। এই মানুষ হয়ে—মানুষের হুঁশ ক'জনের আছে! তাহ'লে এই দুনিয়ায় এত দুঃখ থাকে? আমরা সকলে সকলের দুঃখ ভাগ করে নিতাম।

বিশু—, "নেওয়া ত উচিত। বৃদ্ধ পথচারী— "এই উচিত বোধ থাকলেই তবে মানুষ মানুষ হয়। নইলে নয়।" বিশু— "যাক্ একটা গান ধর ত বাবা।" জ্যোতি গান ধরল।

ভৈরবী

"মনের সাধে শিবের হৃদে দাঁড়ায়েছ মা পদ দিয়ে—
ছল করে জিব বাড়িয়ে আছ মা, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
বল্ দেখি মা ওমা তারা, তোর দেশের কি এমনি ধরা॥
ওগো তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়াত মা পদ দিয়ে॥"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক—, "বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, মায়ের চরণে তোমার মতি থাক, মা-ই তোমার হাত ধরে নেবে।" বলে দুটো টাকা জ্যোতির হাতে দিয়ে উঠে গেলেন। বিশু মাঝি— "আমিও উঠি, ছোঁড়ারা পালে পালে হৈ-হৈ করতে করতে আসছে। আজ আবার কি আছে? স্কুলের নামেতো রোজই শুধুশুধু হৈ—হুজ্জুতি।" বলে উঠে পড়ল। ঘাটে নেমে বিশু জিজ্ঞাসা করল—, "হাঁ রে! তোরা এমন 'হৈ-চৈ করছিস্ কেন? আজ আবার তোদের কি হ'ল?" কয়েকজন ছেলে একত্রে উত্তর দিল—, "আজ আমাদের স্কুলের বলখেলা, তাই স্কুল হবে না।" বিশু—, "বেশ, তবে আনন্দে বাড়ী যাও।" আবার কয়েকজন ছেলেমেয়ে একত্রে উত্তর দিল—, "আমরা স্কুলের খেলা দেখতে যাব না?" বিশু—, "তা—যাও।" কিছু ছেলেমেয়ে পার হয়ে চলে গেল খেলার মাঠে, আর কয়েকজন মাত্র থাকল এপারে। তার মধ্যে সুলেখা ও তার বান্ধবী অনিতাও আছে। অনিতা বল্ল—, "চ সুলেখা, তোর কানা জ্যোতির কাছে যাই, একটা গান করতে বলবি।" সুলেখা—, "আহা, কথার কি ছিরি! আমার কানা জ্যোতি, কেন, কেউ অন্ধ হয় না? তাই বলে তাকে কানা বলে ডাকতে হবে?" আর একটি মেয়ে একটু মুচকে হেসে অনিতাকে পেনসিলের খোঁচা দিয়ে বল্ল—, "তোর এত গায়ে বাঁধছে

কেন? কত দরদ্।” সুলেখা উত্তর না দিয়ে পারল না—, “দেখ। মানুষ মাত্রেরই একটা ভদ্রতা থাকা দরকার, বিশেষ করে যারা লেখাপড়া করে। যদি ধর, তোর বাবা কিম্বা দাদা কেউ ট্যারা হয় তবে কি বলতে হবে—তোর ট্যারা বাবা, ট্যারা দাদা।” কথাকটা শুনে মেয়েটি ফস্ করে উঠল—, “আমার বাবা দাদা তুলবি না সুলেখা!” সুলেখা—; “তবে দেখ বুঝে, নিজের কেউ হলে, যে যা তাকে তাই বল্লে কেমন লাগে।” সুনিতা—, “তাতে তোর কি? কানা কে কানা বলেছে।” সুলেখা—, “আমার আবার কি? মানুষ কেন মানুষকে সহানুভূতি, শ্রদ্ধা করবে না? এতে কি পয়সা খরচ হয়? না, তার আচার আচরণ, ভদ্রতা অভদ্রতা প্রকাশ পায়!” মেয়েটি—, “তা তোর এত গায়ে ফোসকা পড়ছে কেন?” সুলেখা—“যেমন ফোসকা তোর পড়ল।” সুনিতা—, “তা বেলা, তোরই বা এত অসহ্য কেন? কানা না বলে অন্ধও তো বলা যায়। ওর যদি ভাল লাগে, অন্ধ বলে কি সে মানুষ নয়?” সুলেখা রেগে গিয়ে বল্ল—, “তোরা নিতান্তই অ-মানুষ, তাই মানুষের দৈব বসে অঙ্গের খুঁত ধরে এত অশ্রদ্ধা।” অনিতা—, “নে নে, খুব হয়েছে; সবাই অমানুষ তুই একা মানুষ। চ' তোর মানুষের কাছে—, আজ আমরা গান শুনব। আজ আর স্কুল-বাড়ীর কোন তাড়া নেই।” সুলেখা—, “আমি তো গান শুনতে আসিনি, স্কুল হ'ল না, বাড়ী ফিরে যাব।” অনিতা ও বেলা একই সঙ্গে—। “নে নে, খুব হয়েছে বাবা, আমরা হার মানছি, আমাদের অন্যায় হয়েছে, অন্যায় স্বীকার করছি। নে চল্ সুলেখা কিছুতে যাবে না; অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের টানাটানিতে সঙ্গে গেল। জ্যোতি আপন মনে বসে ছিল। মেয়ে কটা এসে বল্ল—, “একটা গান কর না জ্যোতিদা!” তোমরা কে?—জ্যোতি জিজ্ঞাসা করল। মেয়েরা উত্তর দিল—, “আমরা স্কুলের মেয়ে, আজ আমাদের স্কুল হবে না, খেলা আছে—, তাই তোমার গান শুনতে এলাম। জ্যোতি— “ওঃ তা বেশ! তোমাদের নাম কি?” মেয়েরা—,

"আমার নাম অনিতা, আর ওর নাম বেলা, আর এর নাম— চিত্রলেখা।" জ্যোতি—, "আচ্ছা লেখা আসেনি? মেয়েরা—, "লেখা? লেখা আবার কে? জ্যোতি—, "লেখা, মানে লেখা। তোমাদের মত মেয়ে। বড় ভাল, কত স্নেহ মমতা।" মেয়েরা—"তাকে চেন?" জ্যোতি—, "কি করে চিনব ভাই!" মেয়েরা—, আচ্ছা তবে কি করে বুঝবে তোমার লেখাকে?" জ্যোতি—, "এ ই—কথার স্বরে, আর হাতের পরশে।" এবার সুনিতা বল্ল— "হাতের পরশে!" বলেই বেলার হাতখানা জ্যোতির দিকে বাড়িয়ে বল্ল—, "দেখত, এটা কার হাত!" জ্যোতি হাতে হাত বুলিয়ে—"না, এ লেখার হাত নয়।" সুনিতা খিল খিল করে হেসে ফেল্‌ল। বেলা এবার সুনিতার হাতটা ধরে বাড়িয়ে বল্ল—, "এবার দেখত, কার হাত!" জ্যোতি এবারও হাতটা ধরে হাতে হাত বুলিয়ে মানিক বাদে উত্তর দিল—, "না, এটাও সে হাত নয়! লেখার হাত কত নরম।" সুনিতা ও বেলা হেসে উঠে বল্ল—, "কেন আমাদের হাত নরম নয়?" জ্যোতি—, "না, তা নয়; দিদি ভাই। তোমাদের হাতও ভাল, তবে এ হাত লেখার নয়, তাই বল্লাম। তোমরা কেন আমায় নিয়ে মস্‌করা করছ ভাই! আমি যদি দেখতে পেতাম তবে তোমাদের মত দেখেই চিনতাম। তা ত হবার নয়, তাই শব্দ বা সুর, আর স্পর্শের ছোঁয়াতেই চিনতে হয় আমাদের জগৎ। এবার অনিতা সুলেখার হাতটা জোর করে জ্যোতির হাতের উপর দিয়ে বল্ল—, "এবার বল ত জ্যোতিদা কে?" জ্যোতি বেশ করে হাতের উপর হাত বুলিয়ে বল্ল—, "এই ত লেখা। তা তুমি কথা বলছ না কেন?" সুনিতা ও বেলা, "বাবা সত্যি সত্যি সুলেখার হাত চিনে ধুয়েছে। তা তুমি কি করে চিনলে জ্যোতি দা?" জ্যোতি—, "প্রথম দিন আমার পয়সা চুরি হয়ে যাচ্ছিল, এই লেখাই আমার পয়সা কটা একটা দুষ্টু ছেলেটার কাছ হ'তে কেড়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল।" সুনিতা

ও বেলা—, "ওঃ বা বাঃ এত তোমার স্পর্শ মনে রাখার ক্ষমতা!' তা আমাদের তাতে ত দূরের কথা, গায়ে কত গুতো মেরে যায় কিছুই মনে স্পর্শ করে না।" জ্যোতি—, "তোমাদের জগৎটা অনেক বড় তাই, আমার জগৎটা অত বড় নয় তাই। শুধু শব্দ, স্পর্শ অনুভূতি মাত্র। আলো, রূপ-রস এ সবের জগৎ হ'তে আমি বঞ্চিত কিনা তাই আমার জগতে ভালবাসা, সহানুভূতি মমতা এই দিয়েই সেই ছোঁয়া-টুকুই সম্বল করে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। বলেই সুলেখাকে উদ্দেশ্য করে বল্ল—, "আচ্ছা লেখা, তুমি কথা বলছ না—কেন? "আমি কত খুঁজছি তোমায়," সুলেখা গম্ভীর গলায় উত্তর দিল—, "কেন?" জ্যোতি একটু থত-মত খেয়ে বল্ল—, "মানে," সুলেখা কথা থামিয়ে উত্তর দিল—, "তা আমার নাম লেখা' নাকি?" জ্যোতি আস্তে আস্তে উত্তর দিল—, "না, তোমার নাম— সুলেখা। আমার মনে আছে। তুমি কত সুন্দর, কত তোমার মমতা, কত দয়া, সেই জন্যে তোমার নামটাও বোধ হয়—সুলেখা অর্থাৎ সুন্দর করে লেখা। তাই নয়! আর আমার দেখ সব উল্টো, কোন কিছু সুন্দর নয়। সব-অন্ধকার। কোন রং-আলো কিছু নেই। আছে কেবল সুরের-লেখা, স্পার্শের লেখা, অনুভূতির একটি সরল-লেখা, কোন বেক-চুর নেই, তোমার 'সু' তোমারই থাক, ও ত আমায় মানায় না; তাই তোমাকে আমার অনুভূতিতে—আমি লিখে নিয়েছি একটা সরল রেখা দিয়ে, তুমি দয়া, মায়া-মমতা দিয়ে লেখা একটি নাম। তাই তোমায় আমি 'লেখা' নামেই ডাকি।" অনিতা—, "এ দেখছি—কবি সাহিত্যিক। তা তুমি লেখাপড়া জান?" জ্যোতি "তা কি করে জানব ভাই, তোমরা পড়, আর আমি শুনি।" বেলা—, 'মানে?' জ্যোতি—, 'মানে, মানে, তুমি মানে, তোমরা, মানে স্কুলের, পাঠশালার ছেলেমেয়েরা পড়া-শুনা করো আমি তা শুনে শুনে পড়া করে নিই।" বেলা—, 'বাঃ বেশ ত তুমি। আমাদের চোখ দিয়ে দেখেও পড়া হয় না।" অনিতা—, "মন,

মনটা থাকে কি ? চোখ থাকলেই হবে ? চোখে যে—মনের মাথা খায়।" সুলেখা এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে বল্ল—, "নাও খুব পণ্ডিতি হয়েছে, স্কুল বাদ দিয়ে এখানেই বিদ্যের টোল বসিয়েছো, চল্ বাড়ি চল্ অনিতা—। না জ্যোতিদা তা নয়, আসলে আজ নিরিবিলি তোমার গান শুনব বলে আমরা এসেছি। সেই গান বাদ দিয়ে অন্য কথা হচ্ছে ত তাইও রাগ করছে। তুমি একটা গান করো না ! জ্যোতি—, "আমার গান শুনবে ? আমি ত আধুনিক গান জানি না, আমার গুরু তা শেখান্ নি তোমাদের কি শোনাব বল !" বেলা—, "শুনেছি তুমি কেষ্টযাত্রার গান ভাল জান, একটা কেষ্ট যাত্রার গান কর না !" জ্যোতি একটু মুচকে হেসে বল্ল, "তবে শোন"। বলে একটা কেষ্ট-যাত্রার গান ধরল।

'অমন করে যমুনার ঘাটে গো বৌ দাঁড়িয়ে থেকো না,
নন্দার বেটা কেষ্ট-মুখপোড়াটা, কালটা ছোড়াটা কেন মরে না।"

সঙ্গে সঙ্গে বাঁয়াটায় "ঘুপ্, ঘুপ্-ঘুপ্, ঘুপ্, ঘুপ্", করে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলো খিল্-খিল্ করে হেসে গড়া-গড়ি। গান থামিয়ে জ্যোতি বল্ল—, "এই জন্যেই ত তোমাদের গান শোনাতে চাই না।" মেয়েগুলো,—"না-না তা নয়, আসলে গানগুলো মজার ; তাই হাসছি।" সুলেখা, "গান শুনবি, ত শুনবি ; অমন হি-হি, করার কি আছে ? তোরা থাক আমি বাড়ী যাচ্ছি।" অনিতা-বেলা,—"নে নে, তোর আর সহ্য হচ্ছে না। চ-যাচ্ছি।" সুলেখা—, "গান শুনবি ত অমন গায়ে পড়ে ঢ'লাঢলি, করছিস্ কেন ? লোকে কি বলবে ?" বেলা—, "কি আবার বলবে ? মজার গান তাই হাসচি, আজ যাই জ্যোতিদা তুমি কিছু মনে করো না, আমরা ও-রকম হাসি।" জ্যোতি—, "হাঁ-ভাই, হাসবে বৈকি. হাসিই ত জীবন। আমি কিছু মনে করিনি।" ওরা তিনজনেই উঠি বলে চলে যাচ্ছে, সুলেখা কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে টিফিনের কৌটাটা জ্যোতির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বল্ল—, "তুমি এই টিফিনটা

খেও। আজ ত স্কুল হ'ল না; বাড়ী নিয়ে গিয়ে কি করব?' জ্যোতি,—"তোমার কৌটটা? সুলেখা—"থাক্, সামনের দিন নেব, চিন্তা করো না।" জ্যোতি—"লেখা; তুমি রাগ করেছ। আমি ত........" সুলেখা—, "তাহলে রাগ করেছি ভাবছ কেন? আজ আসি।" বলে সুলেখা চ'লে গেল। জ্যোতি কিছুই দেখতে পেল না বটে, তবে যে দিক দিয়ে সুলেখা গেল সেই পথের দিকে পায়ের শব্দের দিকে কান পেতে কিছুক্ষণ আনমনে চুপ করে থাকল।

খানিক বাদে বিশু মাঝি এসে ডাক দিল— "হাঁ রে অমন করে ওদিক পানে চেয়ে চুপ করে বসে কি ভাবচিস্! বাড়ী যাবি না? জ্যোতি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উত্তর দিল—, "কিছু না, কাকা। কি আর ভাবব? হাঁ—, এই যাই। গিয়ে ত সেই তক্তাপোষে চুপ করে বসে থাকা।" বিশু—, "তা আজ কি খাবি?" জ্যোতি— "এই টিফিন দিয়ে গেল লেখা। আর যা হয় খাবখোন্।" বিশু— "বাঁয়া রেখে যা, আমি ঠিক্ করে রাখব। তুই বরঞ্চ চান্ করে যা, টিফিনটা খা, আমি আজ একটা ভাল মাছ পেয়েছি, দুটো ভাত নিয়ে যাব, খাসখুনি। এখন বাড়ী যা।" জ্যোতি নদীতে স্নান সেরে টিফিনের কৌটাটা হাতে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

জ্যোতির দিনগুলো দিন-গত পাপ-ক্ষয় করে সকালে উঠে আটটা হ'তে নটার মধ্যে ঘাটে এসে বটতলায় বসা, আর কটা গান করা এবং বারোটা একটার মধ্যে তার ঘরে ফেরা, এই একই ভাবে একঘেয়েমি রুটিং হয়ে গিয়েছে। কোন দিন শুকনো চিড়ে-মুড়ি, নয় চা-পাউরুটী, আর নয় দুটো চাল কিনে পাশের বাড়ী কাউকে দিয়ে দুটো ভাত চাওয়া, আর না হয় বিশু কাকার কাছে খাওয়া—, এই ভাবেই তার দিন চলতে লাগল। মাঝে মাঝে নিজের কাছে নিজেকে বিদ্রোহ করতে চায়—, কিন্তু উপায়! যার নেই নিজের পায়ের মাটি ঠিক

সে লড়াই করবে কার সঙ্গে। তাই তাকে তার ভাগ্যকে মানা ছাড়া আর কি উপায় আছে! তাই আত্ম-বিদ্রোহের পর দ্বিগুণ ক্লান্তিতে আবার নিজের নিয়তিকে মেনে নিয়ে গুমরে গুমরে থাকতে হয়। আজ তিন দিন জ্যোতি বাইরের জগতের মুখামুখি হয় নি। তার প্রিয়জনেরা খোঁজে, কিন্তু জ্যোতি তার সীমিত সীমানায় ঘরে তক্তায় শুয়ে বসে যখন আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তিন দিনের দিন তার পুরাতন বন্ধু দামোদরের ঘাটের ধারে প্রিয় বটতলায় এসে বসল। ঘাটের উপর চায়ের দোকান, দোকানের মালিক মদন মালি জ্যোতিকে পরপর তিন দিন বাদে আসতে দেখে ঠাট্টা করে বল্ল, "কি গো জ্যোতিবাবু! এতদিন কোথায় ছিলে? শ্বশুর-বাড়ী?" জ্যোতি বছর কুড়িতে পড়েছে। দেহে ও মনে যৌবন এসেছে। অন্ধ হ'লেও বোঝে শ্বশুর বা শ্বশুর বাড়ী কি? তাই ঠাট্টা হজম করে বল্ল—, 'হ্যাঁ, কথা ছিল; অপেক্ষা করে বসেও ছিলাম; কিন্তু শ্বশুর তাঁর সোজা বাঁশের রথটা পাঠাল না। তাই তোমাদের কাছেই আবার ফিরে এলাম!" নিছক্ ঠাট্টা করতে গিয়ে দোকানিও একটু অপ্রতিভ হ'ল। এমন সময় বিশু মাঝি ধমকের সুরে বল্ল—, 'রাখ তোদের ঠাট্টা, ঠাট্টা করার আর লোক পেলি না? তা হ্যাঁ-বাবা, তোর কি হয়েছিল যে পরপর তিন দিন আর বাইরে বেরুলিনি?" বলেই আবার নিজের অ-কর্ত্তব্যের হেতুটা ঢাকতে বল্ল—, "আজ তিন দিন আমারও শরীরটা ভাল নয়-গো, ঐ ছেলেগুলোর হাতেই পারানীর ভার ছেড়ে বাড়ী বসে ছিলাম। এই মদন, দাও, আমাদের দুটো করে বিস্কুট ও চা।" মদন-মালি তার কাজের ছেলেটার হাত দিয়ে চাও বিস্কুট পাঠাল। এর মধ্যে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা হৈ-হৈ করতে করতে ঘাটে এসে হাজির। তাদের মধ্যে গোপাল নামে বছর দশেকের একটি ছেলে প্রাইমারী ছেড়ে সবে হাই-স্কুলে এসে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছে, কথা বলতে তার যতটা আটকায় কিন্তু সেই সকলের আগে ফর-ফর করে কথা বলতে

চায়। এই গোপাল এসে জ্যোতির সামনে দাঁড়িয়ে মুখ-খানা টেনে একবার নাকটা কুঁচকে অতি কষ্টে বল্ল—, 'জ্যো-জ্যো, জ্যোতি—দা·········আ! এক বার-গা-গা-গান কর····ও-ওনা! তো-তো-, তোমরর ত-ত, তবলা নি-নি, নিয়ে। ঘুউব, ঘুউব, নানি, নানি, করে বা-বা, বাজাও। সকলে, "হো-হো" করে হেসে উঠল। "দাঁড়া চা-খেয়ে নিই", বলে জ্যোতি চায়ে চুমুক দিল। ছেলেরা, "আমাদের যে দেরী হয়ে যাবে।" বিশু-মাঝি তাড়া দিয়ে বল্ল—, "গান কি বল্লেই হয়? চা-টাও খেতে দিবি না? এখন যা—ফেরার পথে শুনবি।" ছেলেরা—, "ফেরার পথে—বড় খিদে থাকে পেটে, তখন বাড়ী পানে টান থাকে।" বিশু—, "খিদে বুঝি আমাদের আর থাকে না? আজ যা, কাল খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল করে আসবি।" সুলেখাও এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, সে বল্ল—, "আজ আমারও বড় দেরী হয়ে গিয়েছে, ফেরার পথে নয় আগামীকাল আসব জ্যোতি-দা!" জ্যোতি—, "কে—! লেখা? আচ্ছা বেশ, বেশ. তাই হবে, আজ এস ভাই।" ছেলে মেয়েরা সব হুড়-হুড় করে নেমে গেল। বিশু মাঝি—, "একটু বস্ বাবা ছেলে পিলের দল যাচ্ছে, একটু হালটা সামলে আসি।" বলে বিশু মাঝিও চায়ের ভাঁড়টা টান মেরে ফেলে দিয়ে ট্যাঁক্ হতে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে টানতে টানতে নেমে গেল। বেলাও অনেক হয়ে এল দেখে জ্যোতি আরো ছুটি গান করে তার ঘরে ফিরে এল। এই ভাবেই জ্যোতির দিনগুলো কাটতে লাগল। দেখতে দেখতে আশ্বিন মাসের দুর্গা-পূজা এগিয়ে আসতে লাগল। স্কুল-কলেজ বন্ধের সময় এল। হঠাৎ একদিন সুলেখার পূজা-বন্ধের দিন ঘনিয়ে এল। সুলেখার মনটার মধ্যে কেন যেন খচ্ খচ্ করতে লাগল। আবার পুরো এক মাস বাড়ীতে বসে থাকা। কি করে তার দিনগুলো কাটবে? পড়া-শুনা? সে'ত আছেই। বন্ধের পর স্কুল খুলেই তার বাৎসরিক পরীক্ষা। এবার নবম শ্রেণী হতে দশম্ শ্রেণীতে উঠবে। পড়া-শুনার চাপও

তার কম নয়। সে নিজের কাছেই প্রশ্ন করে—, 'কই? তারত এর আগে কোন দিন বন্ধের আগে সে স্কুলে যেতে পারবে না বলে মন খারাপ হয়নি; বরঞ্চ গ্রীষ্মের বা পূজার বন্ধের জন্য মনটা তার ব্যাকুল হয়ে থাকত; কবে গ্রীষ্মের বা পূজার ছুটী হবে! বন্ধের মধ্যে পড়া, পথের ক্লান্তি দূর হবে; এবং পথ-হাঁটার দায় হ'তে সে রেহাই পাবে। পূজোয় কত আনন্দ করবে। বন্ধুদের সঙ্গে সে কত বেড়াবে, কত আনন্দ করবে। আজ কেন তার মনটা পথের আকর্ষণে চঞ্চল? সে কি শুধু পথের টানে! না আর কিছু? কেন? কেন কোন অজ্ঞাত পিছু-টানে তাকে দীর্ঘ কিসের অদর্শনের ব্যথায় মনটা ভরিয়ে তুলেছে! তাহ'লে? তা-হ'লে কি সে সত্যি সত্যি দৃষ্টি-হীন, নিঃস্ব, সম্বল হীন জ্যোতিকে ভালবাসে? সে কেমন করে সম্ভব? জ্যোতির সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ মিলন কি করে সম্ভব? নিঃস্ব—সম্বল-হীন, সহায়-হীন, দৃষ্টি-হীন জ্যোতি তাকে খাওয়াবে কি? রক্ষা করবে কি করে? সত্য বলতে কি অন্যের দয়ায় ও সহানুভূতিতে যাঁর অস্তিত্ব; সে তাকে বহন করবে কি করে? হোক না সু গায়ক, হোক না সুদর্শন যুবক, চোখ যাঁর নেই, তার ত দুনিয়া অন্ধকার! সেই ত কৃপাপ্রার্থী, দয়ার পাত্র, তবে, প্রেম কি সব সময় কাম বা স্বার্থ ও অর্থ হ'তে আসে? না। প্রেম কি এরও বড়? না 'প্রেম'ই অন্ধ? কোনটা ঠিক? ....এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুলেখা আজকাল বেশি অন্যমনস্ক এবং আনমনা থাকে। তা বন্ধু বান্ধবী এবং অন্যের চোখেও ধরা পড়ে। হঠাৎ একদিন সুলেখার মা-ই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—, "হাঁ রে? আজ কাল তুই বড় আনমনা ও রোগা হয়ে যাচ্ছিস্, তোর কি হ'ল? সুলেখা, 'না মা, একে ত পথের ক্লান্তি ও পড়ার চাপ দেখছ না?" মা—, "তা, তুই অত পড়িস্ কেন? আমাদের ঘরের মেয়েরা কেউ কোন দিন চাকরি করেও নি, করবেও না, দুদিন বাদে বিয়ে হয়ে যাবে, যে যার ঘরকন্না করবি; তোর বাবার সখ তুই ছোট বলে

তোকে লেখাপড়া শিখাচ্ছে, একটু কম পড় ও টিফিনটা একটু বেশী করে নিয়ে যাস্।" সুলেখা কোন উত্তর দিল না। সে সকলের ছোট। তারা সাত বোন। ভাই নেই। তার বড় বোনেদের সব বিয়ে থা হয়ে গিয়েছে।

কেবল সেই পড়াশুনা করছে বলে তার এখনো বিয়ে হয় নি। তার বড় বোনের নাম— 'চন্দ্রলেখা', মেজোর নাম 'চিত্রলেখা' সেজোর নাম—, 'মনুলেখা,' ন সেজোর নাম—, 'সুবর্ণলেখা'' তার পরের বোনের নাম—, ''বর্ণলেখা, এবং "রূপলেখা." সকলের ছোট এই "সুলেখা।" এই সুলেখা সরকার "খারি ওপ," গ্রামের সরকার বাড়ীর ছোট মেয়ে। দেখতে ছিপ্ ছিপে্ দোহারা একটু লম্বা গড়ন। মাথা হ'তে পিঠ পর্যন্ত চুলে ভরা. উজ্জ্বল-শ্যাম-বর্ণের, টানা ভ্রুরু টিকালো নাক-চোখ। বিশেষ করে চোখ দুটি মায়া জড়ান অথচ স্থিরপ্রতিজ্ঞের ছাপ। পিতা মণিমোহন সরকারের বড় আদরের। তাঁর সাতটি কন্যা। পুত্র সন্তান নেই। বড় ছয় জনেরই তিনি ভাল ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। তারা সকলেই সুখী, প্রতিটা জামাতাই ঘোর ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। কাজেই তাঁরা সকলে স্বার্থ-অর্থ. সুখ-ভোগ, ভালই বোঝে। মেয়েরা সকলে যথার্থ সহ-ধর্ম্মিনী, স্বার্থ-অর্থ ও গহনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু চেনে না, এবং বাপের বাড়ী এলে আগের বোন-কতটা আদায় করল ও পরের বোন কতটা পেল—এই রেশারেশিই মনে মনে চলে।

কিন্তু সুলেখা তাদের গোত্র ছাড়া। দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, অক্ষমের প্রতি দয়া, দুর্বলের প্রতি মমতা, এই চারিত্রিক গুণগুলি কিছু তার ঈশ্বর দত্ত নিজস্ব, কিছু তার মাতৃকুলের। মা অনেকটা মমতাময়ী। বাবা প্রচুর সম্পত্তির মালিক। বিশেষ করে চাষ ও বাগান আছে এবং বাড়ীর ভিতরে ঘাট বাঁধানো বড় পুষ্করিণীও আছে, তাতেও আয় হয়, ছেলে যখন নেই, সব কটা মেয়েরই যখন

বিয়ে থা হয়ে গিয়েছে—, এবং তারাও অবস্থাশালী ও সুখী, আর সুলেখাও লেখাপড়ায় ভাল, যতদূর পারে পড়ুক, এই ভেবে সুলেখার বাবা সুলেখার বিয়ের বিশেষ চেষ্টা করেন না। তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছেন—, বাদ বাকি সম্পত্তিটুকু যা আছে তা সবটুকুই ছোটমেয়েকে দেবেন, এবং একটা গরীবের ভাল ছেলে দেখে ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রাখবেন। তাতে তার পূর্ব-পুরুষের ভিটায় অন্ততঃ সন্ধ্যা প্রদীপটাও জ্বলবে! তাই সুলেখার প্রতি মণিমোহন সরকার একটু নমনীয়, ও আশাপ্রবণ। পারিবারিক আয় ভালই, স্ত্রীই সব দেখাশুনা করেন, বাড়ীর রাখাল কৃষাণরাই জমিজায়গা চাষবাস করে। তিনি সত্যি বলতে বিশেষ কিছুই দেখেন না, সময়ে দুটো খান, আর বার-বাড়ীতে বসে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, নয় পাড়ার পাঁচজন সমবয়স্কদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেই দিনের অধিকাংশ সময় কাটান। মাঝে মাঝে স্ত্রীর কাছ হতে অভিযোগ না আসে এমন নয়, "সংসারটা কি আমার একার? তোমার কোন দায়িত্ব নেই?" মণিমোহনবাবু শান্তভাবে উত্তর দেন, "অত ভাবছ কেন? দায়িত্ব ত সব শেষ। ছয় মেয়ে বড় বড় ব্যবসায়ীর ঘরে পড়েছে—, তারা সকলেই খুশি, আমাদের ত আর ছেলে মানুষ করতে নেই যে তার ভাবনায় ঘুম হবে না! এখন খাও আনন্দ কর, আর ভগবানের নাম কর।" স্ত্রীর কনকলতা একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দেন—, "কেন, ছোটটার বুঝি কোন হিল্লে করতে হবে না?" মণিমোহন, "এত চিন্তা কিসের? আমার এখনো যা আছে তাতে তার আ-মরণ চলে যাবে। বড়দের ত অনেক দিয়েছি, বাদ-বাকি যা আছে সব সুলেখাকে লিখে দিয়ে যাব।" স্ত্রী,—"সম্পত্তি না হয় দিলে, কিন্তু দেখবে কে? তাও কি ধর্ম্মের নামে থুয়ে দেবে?" মণিমোহন—, "আহা! তারই বা চিন্তা কিসের? বড়গুলোকে টাকার বিনিময়ে সব পার করেছি, সুলেখাকে ত তা করতে হবে না। সে দেখ না লেখা-পড়ায় কত ভাল, প্রতি বৎসর প্রথম হয়ে ক্লাসে উঠে,

তার ভাবনা সে নিজেই ভেবে নেবে, ধর্ম্মই তাকে দেখবে।" স্ত্রী কনকলতা—, "বেশ বাবা, বেশ! সেই সান্ত্বনাতেই থাক্।" সুলেখার দিদি-জামাইবাবুরা—এক এক বারে এক এক জোড়ায় আসে, বোনে বোনে শাড়ী ব্লাউজের, গহনার পাল্লা চলে, কোন্ বোন কোন্ বোনের চাইতে বেশী জৌলুস দেখাতে পারল আর বাবার কাছে—, "আমায়—এটা দাও, ওটা ওকে দিয়েছ, আমায় কেন দেবে না, ইত্যাদি'—নালিশ। সুলেখার দিদিদের প্রতি কোন বিদ্বেষ বা আগ্রহ কোনটাই নেই। এমনকি বাবার কাছে কোন আদর আব্দারও নেই—, যা-পায় তাই খায়, যা-পায় তাই পরে। বাবা এটা লক্ষ্য করে ছোট মেয়ের জন্য নিজে পছন্দ করে ভাল ভাল জামা বা ফ্রক এনে দেন।

সামনে পূজো, সুলেখা এবার নবম-শ্রেণী হতে দশম-শ্রেণীতে উঠবে। তাই তার মা সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার ত তুই বড় হয়েচিস সামনের বারে ক্লাশ টেনে উঠবি, এবার তুই পূজোয় কাপড় নে।" সুলেখা—, "তা দিও। দিদিমণিও এবার কাপড় পরতে বলেছেন।" মা—, 'তা কি কাপড় নিবি?" সুলেখা—, "লাল পাড়—সাদা খোল।" মা হেসে ফেল্লেন,—'দূর, বোকা মেয়ে, লাল-পাড় কাপড় ত স্কুলের জন্য। তোর পূজোয় কি নিবি?" সুলেখা—, "কেন? সেটাই ত পূজোর কাপড় হবে, পরে স্কুলে পরে যাব।" মা হেসে ফেলে বল্লেন—, 'এত বোকা, কোথাও দেখিনি। তোর দিদিরা এসে কোথায় ফরমাস্ করে আদায় করে, আর তোকে দিতে চাইলেও তুই নিতে জানিস্ না!" এমন সময় মণিমোহনবাবু এসে কথা কটা শুনে বল্লেন—, "সেই জন্যেই ত, আমি ওকে ফাঁকি দেবো না। আমিই ওকে নিজে পছন্দ করে এনে দেব।" বলেই বল্লেন—, "যা মা, তোর কাজে তুই যা, ও ভাবনা আমিই নিলাম।"

সুলেখা তার নিজের ঘরে চলে গেল তার পড়ার টেবিলে। পড়তে বসে তার মনে নানান প্রশ্নের ঝড় বইতে লাগল; ভাবে—, "বাবা

এত ভালবাসে, বাবা শুনলে কি বলবেন যে, সে দৃষ্টিহীন পথের ভিখারী জ্যোতিকে ভালবাসে। বাবা দিদিদের বিয়ে দিয়েছেন বড় বড় ব্যবসায়ীদের ঘরে। তাদের কারো আড়ৎ, কারো মেসিন ঘর, কারো বড় ব্যবসা, কারো বা টালির ব্যবসা ইত্যাদি। তাদের কাছে জ্যোতির কোন পার্থিব সম্পদের তুলনাই হয় না। —এ তার জীবনে কি হ'ল! এই সংবেদনশীল মমতাময় মনটা সংসারের ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, জাত-পাতের কোন ভেদ রাখে না।" আবার নিজের কাছেই নিজের যুক্তিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—, "কেন? এ কেমন? ধনী কি শুধু ধনীকেই দেখবে? মানী কি শুধু মানীকেই খুঁজবে? মনের কোন মূল্য নেই? গুণী কেবল গুণীর কদর করবে? প্রাণহীন যদি এই গুণ ও ধন হয়! আর অপরদিকে যাদের ধন প্রতিপত্তি নেই অথচ হৃদয় ভরা প্রাণ আছে? তাদের প্রাণের স্পর্শের কি কোন মূল্য সমাজ সংসারে যাদের মূল্য দেবার সংগতি আছে—তারা কি কেউ দেখবে না? না, তা হতে পারে না; এ শুধু স্বার্থপরতা। এটা তার শুধু আবেগের কথা নয়—, তার বাবার ত এখনো অনেক সম্পত্তি আছে; যা তাকে দেবেন তা দিয়েই সে অন্ততঃ দুটো মোটা ভাত, মোটা কাপড় জুটিয়ে জ্যোতির চোখে আলো জ্বালাতে না পারুক হৃদয়ে ত একটু নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার আশার আলো জ্বালাতে পারবে; এ একতরফা কেমন? মেয়েরা নিজে মূর্খ হবে—অথচ স্বামী খোঁজার বেলায় শিক্ষিত স্বামী নেবে, নিজে দরিদ্রের কন্যা হবে, অথচ কোন ধনবানের পুত্র অনুগ্রহ করে রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে নিয়ে যাবে, আর তার বাবার দানের অক্ষমতার জন্য খোঁটাও দেবে আবার রূপের লালসায় ভোগও করবে, তবুও দরিদ্র পিতারা ও তার কন্যারা নিজেদের বড় বাড়ীর বৌ-এর সম্মান বলে, সৌভাগ্য বলে মেনে নেবে? ছিঃ এর চাইতে সমকক্ষ অথবা প্রেম—অনেক বড়। যদি তাতে অভিভাবকদের অমত থাকে থাকুক! পুরুষে যদি অনেক বড় হয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে কোন

দরিদ্রের মেয়েকে, অথবা কম যোগ্যতা সম্পন্ন মেয়েকে বিবাহ করে মনে প্রাণে খুশি হতে পারে—; তবে যোগ্যতাসম্পন্না মেয়ে কেন আর্থিক অথবা কোন কারণে দৈববশে শারীরিক খুঁত হ'লে কোন পুরুষকে ভালবেসে সুখী হ'তে পারবে না? যদি কোন দৈব-দুর্ঘটনা বিবাহের পর ঘটে, সেটাও ত মেনে নিতে হয়! আর সকল বিষয়ে নারী-পুরুষের সমকক্ষ হ'তে চায়—, অথচ তার স্বামী নির্বাচনে সে যে স্তরেরই হোক—পুরুষ হবে তার চাইতে গুণী-মানী অর্থশালী। বেশ! কিন্তু তাতে নারী শিক্ষার প্রগতি কোথায়? এটাও কি স্বার্থপরতা নয়—। অপরদিকে পুরুষ যদি ধনীর পুত্র হয়ে—, বা উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন পদে থেকে একটি দরিদ্রের কন্যাকে অথবা অসহায় কন্যাকে বিবাহ করে তাকে সুখী করতে পারেন বা হ'ন; তবে একটি ধনীর কন্যা বা উচ্চ-পদাসীন হয়ে কোন নারী একটি অক্ষম বা ধনহীন পুরুষকে বিবাহ করে তার জীবনে বেঁচে থাকার আশার আলো কেন জ্বালাতে পারবে না। এটাও কি নারী শিক্ষার নারী প্রগতি নয়; এটা কি নারী জাগরণের বা নারী চেতনার একটা প্রগতির মহান দিক নয়? কেবল একতরফা স্বার্থ দেখার নাম কি প্রগতি! সাম্য! সমতা? না, তা হতে পারে না। তার বাবা ত তার জন্যে অনেক সম্পত্তি ও অর্থ রাখবেন, বা ব্যয় করবেন, সেই অর্থ ও সম্পদ দিয়ে একজন ধনবানকে আরো ধনশালী বা সম্পদশালী করেও কি মন পাবেন? না ভালবাসার নির্ভরতার আশ্বাস পাবেন? সে তো কেবল জলে জল ঢেলে জল বাড়ান, নয় তেলা মাথায় তেল দেওয়া মাত্র। তাতে ভালবাসা, সহানুভূতি মমতার চাইতে ধন-যৌবন দিয়ে মন রাখা বা মন পেতে চাওয়া মাত্র। এ সে হ'তে দেবে না, এ-সে করবেও না। যদি বাবা মত না দেন? যদি বাবা অন্যত্র জোর করে বিবাহ দেন? না, তা হ'তে পারে না। সে এখন বুঝতে শিখেছে, সে আরো মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, অনেক বড় হবে, স্বাবলম্বী হয়ে জ্যোতিকে জীবনে নির্ভাবনায়—বেঁচে থাকার

আশ্বাস দেবে, প্রাণে আশার আলো জ্বালাবে, সংসারের স্বার্থপরতার নগ্ন—রূপের প্রতিবাদ করবে,।" এবার জ্যোতির কথা মনে পড়ল—, "সে কি সত্যই অযোগ্য? সে ত ভদ্র বংশে জন্মেছিল, নিয়তির বিধানে যেখানে মানুষের কোন হাত নেই—সেই নির্ম্মম ভাগ্যচক্রে তাকে দৃষ্টি হারাতে হয়—, সে ত নিরোগ সুপুরুষ—, সে ত বুদ্ধিমান ও সু-গায়ক, সঙ্গীত ত সমস্ত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, যার সুরে জীবনের ব্যথার সমস্ত দুঃখের বরফের—পাহাড় গলে জল হয়ে যায়। বড় লোকের ছেলে-মেয়েরা, বা বড় বড় জমীদার পরিবার 'ওস্তাদ্' রাখেন বা নিজেরাও সঙ্গীত চর্চ্চা করে কত সুনাম অর্জ্জন করে অমর হয়ে থাকেন। জ্যোতির সে গুণটাও ত ঈশ্বর তাকে অকৃপণ হস্তে দান করেছেন। তবে সমাজে সে কিসের হীন? কিসের অমর্যাদার? কিসের আর পাঁচ জনের চাইতে কম মর্যাদার? না—, সে স্বাবলম্বী হয়ে জ্যোতিকেই স্বামী বলে গ্রহণ করবে। এতে আর যারাই তাকে নিন্দা করুক—, সত্যের কাছে, ঈশ্বরের কাছে নিশ্চয়ই সমর্থন বা আশীর্বাদ পাবে—।"

এমন সময় সুলেখার মা ঘরে ঢুকে বল্লেন—, "অমন করে কি এত ভাবছিস্? তোর চেহারাটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, নিজের যত্ন নিজে জানিস্ না? অত বড় মেয়ে—ঘরে অত দুধ তবুও হাতে তুলে না দিলে নিয়ে খাবি না।" বলে একটা দুধের গ্লাস সুলেখার হাতে তুলে দিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন—, "তোদের স্কুল কবে বন্ধ হবে?" সুলেখা—, "সামনের শনিবার ক্লাস হয়ে—।" মা—, "খুলবে কবে?" সুলেখা—, "খুলবে সেই ভাইফোঁটার পরদিন।" "আজ স্কুলে যাবি না? বেলা যে হ'ল। এতখানি পথ যাবি!" সুলেখা—, "আজ আর যাব না মা।" মা—, "কেন? তুই ত—স্কুল কামাই করিস না!" সুলেখা—, "আজ আর ভাল লাগছে না—মা।" মা—, "তা যা ভাল হয় কর বাপু। তবে উঠ্। আজ একটু তোর মাথায় ভাল করে তেল দিয়ে দিই, যা—

তেলের কৌটটা আন” বলেই মা ঘরের বাইরে নিজেই তেল চিরুনী আনতে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে জ্যোতি যথারীতি তার নিয়মমাফিক ঘাটে এসে বসে। নানান লোকজনের মাঝে, সকল ছেলেমেয়ের মাঝেও কানখানা পেতে রাখে কখন লেখা এসে তাকে ডাকবে। কিন্তু পরপর দুদিন গেল, লেখা আর এল না। ভাবে—, “লেখা হয় ত কোন বড়লোকের মেয়ে, ক্লাস নাইন-এ পড়ে সে তাকে দয়া করে একটু সহানুভূতি দেখায় মিষ্টি ব্যবহার করে, তার কথা তার মনে স্থান পাবে কেন? এ তার অন্যায় ভাবা ও অবুঝের অভিমান। কিন্তু ভালবাসা বা অধিকার যখন পাওয়া যায়, তখন কি আর হিসাব করে মেপে মান-অভিমান হয়? না—যোগ্যতা বা কতটা অধিকার সত্যি সত্যি বর্ত্তাবে তা বুঝেও সে অবুঝ হয়ে পরে। ভালবাসার অধিকারের এমনই রীতি।” তবুও জ্যোতি নিজেকে নিজের দূর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে সামলে নিয়ে সান্ত্বনা পেল—, ‘সত্যি ত! লেখার মত মেয়ে তাকে মনে রাখবে এ ত তার কাছে আকাশ-কুসুম ভাবা। লেখার মনে স্থান পাবে এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। যাক্— লেখা ভালই থাকুক। সে জীবনে সুখী হোক। তা শুনেও আমি সুখি হব।” আবার ভাবছে—, “এ কি! তার ত শরীরটা খারাপও হতে পারে! তাই যদি হয়, হে ঈশ্বর! তার মঙ্গল কর! তাকে সুস্থ রাখ। এমন সময় সুলেখা জ্যোতির বাড়ী খুঁজে বাড়ী গিয়ে হাজির। সুলেখা দেখল জ্যোতি তার ঘরের বারান্দায় একটি বড়-তক্তাপোষে চিৎ হয়ে শুয়ে আনমনা হয়ে আছে। সুলেখা—, “জ্যোতি দা: তুমি কি ঘুমাচ্ছ!” জ্যোতি লেখার গলা শুনে ধর-মড় করে উঠে বসে চোখ দুটো রোগড়ে মনের আবেগটা সামলে বল্ল—, “কে? লেখা নয়!” সুলেখা—, “হ্যাঁ, তুমি আজ বাইরে যাওনি;” জ্যোতি—, “না ভাই, গত দুটো দিন গিয়ে বসে থেকে থেকে আজ আর যেতে ভাল লাগল

না। তা তুমি কি করে আমার বাড়ী চিনে এলে ?” সুলেখা—, “দেখ ইচ্ছা উপায় বলে দেয়। জিজ্ঞাসা করলাম।” জ্যোতি খানিকটা চুপ করে থেকে আর চোখের জল সামলাতে পারল না। সুলেখা—, ‘তোমার চোখে জল কেন ? চোখে কি কিছু পড়ল ?” জ্যোতি অনেক কষ্টে নিজকে সামলে চোখ-দুটো মুছে বল্ল—, “না আজ আমার কত আনন্দের দিন, কত সৌভাগ্য, তোমার মত মেয়ে—আমার মত সামান্যকে—যাকে, লোকে অন্ধ বলে অনুকম্পা করে, তাকে তুমি ধন্য করতে এলে, তাকে তার বাড়ী এসে তার কি হয়েছে খোঁজ নিতে এলে, আর ....আজ আমার চোখে আলো নেই যে তোমায় দেখব ; তোমায় একটু হাত ধরে বসাব—, একটু আদর যত্ন করব, এসব হতে আমি বঞ্চিত—একি আমার কম যন্ত্রণা ! কত বড় দুঃখ। সুলেখা জ্যোতির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্ল—, “তুমি দুঃখ করছ কেন ? তুমি আমার চোখ দিয়ে দেখবে। দেখ না—, বল ! তোমার কি কি করতে হবে ; আমিই সব দেখে-শুনে গুছিয়ে দিচ্ছি। তুমি চুপ করে বস।” জ্যোতি আবার দ্বিতীয় দিনে সুলেখার কোমল হাতের পরশে শিউরে উঠল, ভাবল “সে কি স্বপ্ন দেখছে।” না—বাস্তব ! যদি বাস্তব হয়—তবে হে ঈশ্বর কেন আমার চোখের আলো কেড়ে নিলে ? সুলেখা জ্যোতির ঘরে ঢুকে দেখল ঘরের ভেতরটা বেশ বড় ও খোলা, এবং এক কোণে আর একটা বড় চৌকি, তাতে একটা চাদর পাতা তবে ময়লা হয়েছে। এবং তার উপর সুন্দর হারমোনিয়াম্ ও এক-জোড়া বাঁয়া-তবলা ও একটা তানপুরা। আর এক পাশে একটা আলনা তাতে কিছু অ-গোছাল নোংরা কাপড়-চোপড়। দরজার মাথায় একটা তারা-মায়ের ফটো বাঁধান। এবং ঘরের কুলুঙ্গির মধ্যে একটা ছোট্ট পিতলের-পিলসুজের মধ্যে একটা ময়লা পড়া পিতলের প্রদীপ উল্টে পড়ে আছে। আর ঠিক্ উপরে দেওয়ালে টাঙ্গানো সুন্দর রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। বারান্দার এক পাশে একটা চেয়ার ও টেবিল। সুলেখা বুঝল—,

অধিকারী মাষ্টার বিপত্নীক হ'লেও পরিচ্ছন্ন ও রুচিবান ছিলেন। আর ঠিক্ উঠানে একটা তুলসী মন্দির ও তার পাশে একটা বড়-লাল করবী ফুলের গাছ। লাল করবী থোকায় থোকায় ফুটে আছে—, কেউ তা তোলেও না এবং উঠানেও ঝাঁট পড়ে না। তার বাঁ পাশে একটা ছোট্ট রান্না-ঘর, তা বন্ধ এবং একটু দূরে ঈশান কোণে একটা পায়খানা ও বাথ-রুম ও কাছে একটা কল। এক নজরে সুলেখার এই নির্জন বাড়িটা সাজানো ও রুচিসম্মত বলে মনে হল। ভালই লাগল, তবে অজ্ঞাতে আপনা হ'তে একটা দীর্ঘ-শ্বাস পড়ল—কে কাকে দেখে ? লোক অভাবে বড়ই ফাঁকা ও অগোছাল। এক নজরে বাড়িটা খুঁটিয়ে দেখে সে কোমর বেঁধে লেগে গেল বাড়ি গোছাতে। ঘরের মধ্যে ও বাইরে ঝাঁট-পাট দিয়ে, আলনার কাপড় চোপড় গুছিয়ে—, উঠানটা ঝাঁটিয়ে হাত-পা ধুয়ে এক বালতি জল তুলে জ্যোতিকে বল্ল—, "তুমি চোখ মুখটা ধুয়ে নাও। আর এই চিড়ে মুড়কী থাকল, আমি বাড়ী হ'তে এনেছি, খেয়ো। এখন একটু জল খাও, বলে চারটা নারকেল নাড়ু জ্যোতির হাতে দিল। জ্যোতি সুলেখার হাতটা ধরে বল্ল, "আমার অনুরোধ, লক্ষ্মী ভাই তুমি দুটো নাও। আমি খুশি হ'ব। আমার ত দেবার কিছু নেই—, তবুও গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা !"

সুলেখা—, "না না, তোমার অত সঙ্কোচ কেন ? এই দেখ আমি নিলাম, তুমি খুশি ত" ? জ্যোতি আবেগে, আনন্দে কি বলবে ভেবে না পেয়ে বল্ল—, "তুমি কত বড়, কত মহৎ।" সুলেখা—, "আরে না না, এ তুমি কি বলছ ? আর জ্যোতিদা ! আগামী কাল হ'তে আমাদের স্কুলে পূজোর ছুটী হবে, একমাস ছুটী ; আমি অবশ্য এর মধ্যে এক-আধ দিন আসব ; তবে বোঝ ত বেশী আসা সম্ভব নয়। তবে বিশু কাকাকে বলে যাব যেন তোমায় দেখে। তুমি একটু সাবধানে থাকবে।" জ্যোতি—, "না-না, বিশু কাকাকে কিছু বলতে হবে না, কিছু যদি মনে করে।" সুলেখা—, "মনে যদি করে তা করুক ! নিতান্ত

অবুঝেরা বা ঈর্ষাকাতররাই মনে অনেক কিছু করে, তবে বিশু কাকা তাদের দলে নয় বলেই আমার বিশ্বাস। বুঝমান সেয়ানারাই মনে অনেক কিছু করে— ।" বলে সুলেখা জ্যোতির ঘরের বারান্দা হ'তে নেমে উঠানে দাঁড়িয়ে বল্ল—, "আজ তবে আসি।" জ্যোতি—, "এসো ভাই।"

সুলেখা জ্যোতির বাড়ী হতে বেরিয়ে বই নিয়ে পার ঘাটে আসতে— দেখল, একটা কালো ঠোট-পুরু ছেলে মাথায় একরাশ চুল এবং জুলপিটা নামতে নামতে একেবারে গালের অর্ধেক পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। সে মদন-মালীর চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে ও একটা আধ পোড়া বিড়ি কিছুতে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, তবুও টানতে টানতে গাল দুটো তুবড়ে যাচ্ছে—তবুও টানতে ছাড়ছে না, সে সুলেখাকে উদ্দেশ্য করে অথচ যেন—আপন মনে বল্ল—, "আজ-কাল স্কুল কি এই দিকে হল।" সুলেখার কথা-কটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল—, "হ্যাঁ, তুই কি ভর্ত্তি হবি? পথ যদি না চিনিস্ আয় দেখিয়ে দেব— ।" মুখের উপর এমন উত্তর পাবে ভাবতেও পারেনি ছেলেটা। মুখখানা কাচু-মাচু করে কোথায় পালাবে ঠিক্ করতে পারল না। এমন সময় বিশু মাঝিকে ঘাটের নিচ্ হ'তে উপরে দোকানের দিকে আসতে দেখে সুলেখা বল্ল—, "কাকা তোমার খোঁজ করছিলাম।" বিশু—, "কেন মা!" সুলেখা, "মা—কটা কথা বলে পাঠিয়েছেন।," বলে সুলেখা বিশুর দিকে এগিয়ে গেল; বিশু সুলেখার কাছে এগিয়ে এসে বল্ল, 'কি—মা?' সুলেখা একটু নিচু গলায় বল্ল—, "আমি বাড়ী গিয়ে জ্যোতি-দার কথা গল্প করায় মা কিছু চিড়ে মুড়কি দিয়েছেন জ্যোতিদার বাড়ী গিয়ে দিয়ে এলাম; আর এই দশ টাকা দিয়েছেন—কিছু শুকনো খাবার কিনে দিতে, তুমি কিনে দিও।"— বলে সকলের সামনে একটা দশ টাকার চক্‌চকে নোট বিশু মাঝির হাতে দিল। চায়ের দোকানি ও সকলে জানল সুলেখা বিশুর খোঁজেই গিয়েছিল। এবং পারিবারিক ব্যাপার। তাই মদন-মালী ও আর সকলে ঐ

অসভ্য ছেলেটিকে তিরস্কার করল—, "তুমি চা খেতে এসেচ চা খাবে, কেন একটি ভদ্র ঘরের মেয়ের পিছনে অভদ্রের মত উক্তি করবে? খবরদার! আমার এটা চায়ের দোকান হ'লেও ছেবলামির আসর নয়।" ছেলেটা আরো অপদস্থ হয়ে মাথাটা নিচু করে পালাতে পথ পেল না। এদিকে বিশু দশটাকার নোটটা নিয়ে বল্ল—, "তা আমি কেনার চাইতে তুমি কিনলেই ভাল হ'ত না মা! তাতে আমি মুখ্য-শুখ্য মানুষ········" বিশুর কথা শেষ না হ'তেই সুলেখা বিশুর কথার মাঝেই বল্ল—, 'না—কাকা, ছেলেমেয়ে যতই লেখা-পড়া শিখুক তবুও বাপ-কাকার চাইতে বেশি চালাক ভাবা ঠিক নয়।" বিশু—, "আহা! মায়ের আমার কত বুদ্ধি। কত সম্মান-জ্ঞান! সাধে কি বলে বড়-ঘরের ছেলে-মেয়ে বড়ই হয়।" বিশু খুশি হয়ে বল্ল—, "আচ্ছা মা তাই হবে; তুমি স্কুলে যাও, আমি সব ব্যবস্থা করবো মা।" সুলেখা পার ঘাটে চলে গেল। বিশু মদন-মালীর দোকানে গিয়ে বসে বল্ল—, "দাও ভাই একটা কড়া করে চা দাও। মাথাটা বড্ড ধরেছে।" মদন মাঝি জিজ্ঞাসা করল—, "কি হয়েছে গো" বিশু—"জ্যোতির কষ্ট শুনে সুলেখার মা সুলেখার হাতে দশটা টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে, আমি যেন কিছু কিনে দেই।" বিশু পাল্টা প্রশ্ন করল, "তা তোমাদের কি হ'ল গা! অমন করে ছেলেটাকে তাড়ালে?" মদন—, "আর বলো না, অসভ্য ছেলেটা সুলেখাকে দেখে একটা টিট্‌কারি মেরেছে।' বিশু—, "ওঃ তা ঠাস্ করে একটা চড়্ দিলে না কেন?" মদন—, "বাছাধন জেনেছে এটা চায়ের দোকান বলে ছেবলার আসর নয়। কোথাকার কাদের ছেলে—আজ ওতেই যথেষ্ট হয়েছে।" বিশুর হাতে মদন-মালী চায়ের ভাড়টা ধরিয়ে দিতেই বিশু এক চুমুক দিয়ে—হাঁক্ পাড়ল—, "তোরা একটু চুপ করে বোস—। আমি যাচ্ছিরে!" আপন মনে আবার বল্ল, "চা-টাও একটু খেতি দিবি না!"

পরের দিন শনিবার 'আমতা—বালিকা বিদ্যালয়' ও অন্যান্য স্কুলের

আজ পূজা বন্ধের দিন। বেলা সাড়ে নটা না বাজতেই ছেলেমেয়েরা আজ একটু চক্‌চকে হয়ে সেজে-গুজে খুব একটা খুশি-খুশি মনে কল্‌-বল্‌ করতে করতে পার-ঘাটে এসে হাজির। বিশু মাঝি—, "আজ হ'তে এক মাস তোদের ক্যাল-ব্যালানি শুনব না রে! মনডায় বড্ড খারাপ লাগবে। যা তোরা—পূজোয় শুধু আনন্দ করলে হবে না—, পড়া-শুনাও ত করতে হবে।" কটা ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে উত্তর দিল—, "হ্যাঁ কাকা, তা করবো বইকি। স্কুল খুলেই আমাদের পরীক্ষা।" বিশু-মাঝি স্কুল-কলেজের সকল ছেলে-মেয়েদের—'কাকা', আর মাঝারিদের 'বিশু-খুড়ো' এবং বয়স্কদের—'বিশু-ভায়া।' সকলেই হৈ হৈ করতে করতে পার হয়ে গেল। তখন জ্যোতি এপারে গান ধরেছে—, "হরি! দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।" গানটা শেষ হতে যে যার গন্তব্য স্থলে চলে গেল, সুলেখা আগের খেয়ায় পার হয়নি; একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যোতির কাছে এসে বল্ল—"আজ আমাদের স্কুলের বন্ধের দিন। মনটা বড় খারাপ লাগছে—, তবে মধ্যে একদিন আসব।" জ্যোতি—"ওঃ লেখা! কাল সন্ধ্যায় বিশু কাকার কাছে সব শুনেছি। তোমার কত প্রশংসা করল কাকা, এমন লক্ষ্মীর পদধূলি পড়েছে বলেই তোর বাড়ীঘরেরও কত রূপ পালটেছে।" কথায় বাধা দিয়ে সুলেখা বল্ল—, "এই বন্ধে ত বুঝতেই পারছ রোজ রোজ বা ঘন-ঘন আসা সম্ভব নয়। তবে আমি বিশু কাকাকে বলে দিয়েছি, তুমি বিশু কাকার কাছেই খাবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবে।" জ্যোতি একটু বাধা পেয়ে সুলেখার কথা শেষ হ'তেই একটু ঢোক গিলে বল্ল—, হ্যাঁ করবো। তবে ছুটিতে তুমি মন দিয়ে পড়ো, তুমি কত বড় হবে! তা শুনে ও জেনে আমি কত খুশি হব। আমার জন্যে চিন্তা করো না। জানই ত যত্নের মধু পিঁপড়েয় খায়—, আর অ-যত্নের মধু গড়াগড়ি যায়—।' সুলেখা—, না! এটা ঠিক কথা নয়। পিঁপড়েয় যখন খায়—তখন খাতির করে যত্ন আর অ-যত্ন বেছে খায় না। যা পায় সমানে তাই

খায়।" জ্যোতি হেসে ফেল্ল। বল্ল—, "আচ্ছা আচ্ছা—, আমিও যত্নে থাকব।" সুলেখা—, "তাহলে আমি, আগের খেয়াটি ছেড়েছি—একটু দেরীও হয়ে গেল।" জ্যোতি ব্যস্ত হয়ে—, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, এস ভাই! তবে তুমিও ছুটীতে সাবধানে থাকবে।" সুলেখা জ্যোতির কথা কটা শুনে হাসতে হাসতে নিচে পার ঘাটের দিকে নেবে গেল। এর পর জ্যোতিও বেশীক্ষণ না থেকে কিছু সময়ের মধ্যে তার ঘরে ফিরে গেল।

সন্ধ্যার একটু আগেই বিশু মাঝি এসে জ্যোতির ঘরের বারান্দায় বসে বিড়িটা শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্ল—, "আজ বড় অপরাধী হলাম, কথা দিয়ে কথা না রাখা বড় অন্যায়।" জ্যোতি—, "কার কাছে কাকা!" বিশু—, "মা লক্ষ্মীর কাছে। আমিই বা-কে? আর তুই-ই বা কে? তবু তার কাছে কত আপন—, কত দরদ!" জ্যোতি—, "কার কাছে কে কত আপন কাকা?" বিশু—, "এই মা সুলেখার কথাই বলছিলাম, আমার প্রতিও কত দরদ! তোর প্রতি তার কত কর্তব্য! যা-কিনা তোর কাকা-কাকিমা, জেঠা-জেঠিমাও পাড়া-পড়শি মোড়ল-মাতব্বরদের ও আর পাঁচজনের করা উচিত ছিল, তা সমাজে আর কেউ করল না রে। আর মায়ের আমার কত দরদ! তোকে কে দুটো ভাত বেঁধে দেবে, কোথায় তোর খাওয়া হবে? চিড়ে মুড়িতে কি আর পেট ভরে। সব বুঝে আমাকে নগদ দুটো দশটাকার নোট দিয়ে বলেছে, এই টাকায় চাল কিনে রেখো, আর কাকিকে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত দিতে বলো। আব তোর উপায়ে তোর জল-খাবার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কথা বলেছে। আমি টাকা হাতে নিলাম, কথাও দিলাম, কিন্তু আর খেয়াল নেই! তোর কাকিকে এবেলায় বল্লাম—," জ্যোতি—, "তাতে কি হয়েছে? আমি পাউরুটী ও চা আর লেখার দেওয়া নাড়ু-মুড়ি ছিল, দিনটা'ত বেশ গিয়েছে।" বিশু—, "আহা! তোর না হয় দিনটা গেল, দিন কি কারো আটকে থাকে? কিন্তু আমার কথা দিয়ে কি কথার

দাম থাকল!" জ্যোতি—, "তুমিও ত সাত ঝামেলার মানুষ কাকা! তা আমার ত দিন একভাবে যাচ্ছিল, তুমি কেন ও-ভার নিতে গেলে? বিশু—, "ভার আর কি? আমরাও ত দু-বেলা দু-মুঠো যা হোক খাই, সে কথা নয়। কথা বড় অশান্তি আর ঝামেলা। তোর কাকীর শরীরটাও ভাল নয়। তাতে বড়-মেজ ছেলের বে-থা দিয়েছি, তাদের অশান্তিতে আরো অশান্তি।" জ্যোতি—, "কেন কি হ'ল কাকা!" বিশু—, "মনটা আজ বড় খারাপ বাপ্! কি আর হবে বল! তোর এক দুঃখ—আর আমার শতেক দুঃখ—," বলে বলতে লাগল—, "আমারা অন্ততঃ সাত-পুরুষ ধরে এই ঘাটের ইজারাদার। কেউ না কেউ ঘাটে থাকি। আর আর সকলে নয় মাঠে চাষ-আবাদ নিয়ে থাকে, নয় অন্য কাজ করে পেট চালায়। তাই ছোট ছেলেকে নিয়ে আমি ঘাটে থাকি, আর বড়-দুটোকে মাঠে চাষ আবাদে দিয়েছি। কিন্তু তারা বৌ নিয়ে হাঁড়ি আলাদা করল। কোন বৌ-মা দেখেও দ্যাখেন না, এমন কি তোর কাকির জ্বর-জ্বালা হলেও খোঁজ লেয় না, ডাকলে ফিরে চায় না। দোপরে ভাত খাব কি, তোর কাকীর মুখে শুনলাম, বেটারা বৌ-এর কথায়—আর কিছু বদ্ লোকের কথায় বলেছে—, সম্পত্তির সব সমান ভাগ চায়। আছে ত মাত্র ছ-বিঘে জমি, তা দু-বিঘে করে বড় দুজনকে চার বিঘে দিয়েছি—, বাকি দু-বিঘা সেত ছোটোর জন্যে আছে। আমরা বাপ বেটায় যখন যা পারি তা শাসন করি। তারা বলতে চায় ও দু-বিঘাও আমাদের দিয়ে দাও। ছোট ঘাট নিয়ে থাক্। ....এ কি অন্যায় কথা! জমি সকলকে সমান দিয়েছি, আর ঘাটটা! সে আমার। আমরা বুড়ো-বুড়ি কতদিন বাঁচব কে তা বলতে পারে। আমাদের কে ভাত কাপড় দেবে? ছোটটার এখনও বে-থা হয়নি তাই কাছে আছে, বে-থা হলেই ত বৌ-নিয়ে আলাদা হবে, এটা ত ধ্রুব সত্য। তখন ঐ ঘাট-ই আমাদের ছেলে হয়ে দেখবে, ঘাট ইজারা দিলেও চলবে। আর........আমরা গত হলেই ত তোদের। তখন তোরা যা হয়

করে নিস্। দেখতেও আসব না। স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছি। মানুষ করেছি—, বে-থা দিয়েছি, দু-বিঘে করে জমি দিয়েছি—; নিজের জমিতে খাট, পরের জমিতে খাট খাও। ঘাট? আমরা যতদিন, ঘাট ততদিন আমাদের। ওখানে কারুর ভাগ চলবে নি।" জ্যোতি—, "কি আর বলব বল! তা তোমার ছোট ছেলে কি বল্ল।" বিশু—; "কি আর বলবে। এখনো বে-থা হয়নি, তাই এখনো আমার হয়ে আছে। আমার সাথে সাই দিয়েছে।" বলেই—, "উঠি বাপ্, অনেক রাত হয়েছে, তোর জন্যে দুটো ভাত আনি?" —বলে বিশু মাঝি তার বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

এদিকে সুলেখার পূজার ছুটী হয়ে গিয়েছে। পূজার আর বিশেষ দেরী নেই দেখে সুলেখার মা একদিন সুলেখাকে ডেকে বল্লেন—, "হাঁ রে! এবার তুই কাপড় নিবিত? আমতায় যা একদিন! যা নিবি পছন্দ করে নিয়ে আয়—," সুলেখা—, "বাবাই ত বলেছে পছন্দ করে আনবে।" মা—, "বাবা না হয় কাপড় কিনল, কিন্তু তুই বড় হয়েচিস্, তোর ব্লাউজ-সায়া, ব্রেসিয়ার ত তুই পছন্দ করে আনবি!" সুলেখা খানিক চুপ করে থেকে বল্ল—, "তা বেশ কালকেই যাবখোন।" বলেই আবার ডাকল—, "মা!" মা ফিরে তাকিয়ে বল্লেন—, "কেন? আবার কি হ'ল?" সুলেখা—, "মা বলছিলাম—," মা—, "কেন? কি বল! আমার আর কাজ নেই?" সুলেখা—, "বলছিলাম—, বেতাই ঘাটের উপর বসে যে ছেলেটি গান করে, তাকে একটা কাপড় দিলে হয় না?" মা খানিক চুপ করে থেকে বল্লেন—, "হ্যাঁ ঐ দৃষ্টিহীন ছেলেটা? ছেলেটি বেশ দেখতে, দেখেও বোঝা যায় না চোখে দেখে না, চোখে কি এমন হয়েছিল কে জানে। আহাঃ তোরা পরপর সাত বোন, আমার অমন একটি অন্ধ ছেলে থাকলেও তবুও ঘর আলো করে থাক'ত। আমার ভিটায় ত বংশের বাতি জ্বলত!" বলেই আবার বল্লেন—, "তা একটা কাপড় কেন? একটা ভাল গেঞ্জীও

কিনে দিও।" বলেই মা একটু আনমনা হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। সুলেখা যেন মায়ের কথা শুনে আশস্ত হলো, তার মনের মধ্য হ'তে একটা গুরুভার নামল। ভাবছিল—কেমন করে সে জ্যোতিকে পূজোয় একটা কাপড়-জামা দেবে! সুলেখার মনে একটা খুশির ভাব এল—তবুও সে জ্যোতিকে এবার পূজোয় একটা নতুন কাপড় দিতে পারবে ভেবে। রাত্রে শোবার আগে মা সুলেখাকে ডেকে বল্লেন—,"কাল সকালে আমি ব্যস্ত থাকব, তুই বরঞ্চ টাকা কটা তোর কাছেই রাখ।" বলে তিনি দুটো একশো টাকার নোট সুলেখার হাতে দিয়ে বল্লেন—, "আগামী কাল সকাল সকাল আমতায় গিয়ে তোর বাবার জন্যে একটা ভাল গেঞ্জী ও ধুতী, আর আমার জন্যে একটা লাল-পাড় শাড়ী নিবি—, আর তোর জন্যে এক জোড়া করে সায়া-ব্লাউজ ব্রেসীয়ার কিনে বাদবাকী টাকায় ঐ ছেলেটার জন্যে একটা ধুতী-গেঞ্জী কিনবি। হবে না এই টাকাতে? সুলেখা—, "হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে বৈকি!"

পরদিন সকাল সকাল সুলেখা আমতার বাজারে কেনা কাটার জন্যে রওনা হ'ল। ঘাটে বিশু মাঝির সঙ্গে দেখা হ'তে—, "আরে আমার মা যে, কোথায় যাচ্ছ গা!" সুলেখা একটু হেসে উত্তর দিল—, "বাজারে যাচ্ছি কাকা! একটু কেনাকাটা করতে, তুমি কিন্তু ঘাটে থাকবে। আমি যেন ফেরার পথে দেখতে পাই।" বিশু-ও একটু হেসে উত্তর দিল—, "আমার মায়ের আদেশ, থাকতেই হবে।" সুলেখা পার হয়ে চলে গেল। সুলেখা বাজারে গিয়ে—আগে তার বাবা-মায়ের জন্য কাপড়-চোপড় কিনল, এবং নিজের জন্যে প্রয়োজন মত যা যা দরকার কিনে একটা প্যাকেটে পুরে নিল। পরে জ্যোতির জন্যে একটা ভাল গেঞ্জী ও মাঝারী ধরণের দুটো ধুতী কিনে একটা প্যাকেট করল। এবং আসার পথে দু-প্যাকেট মিষ্টি কিনে ঘাটে এসে হাজির হ'ল। সুলেখাকে দেখতে পেয়ে—বিশু-মাঝি হাসতে হাসতে বল্ল—, "মা—! আমি তোমার ফেরার

অপেক্ষায় আছি। কখন আমার মা আসবে—বেলা দশটা প্রায় বেজে গেল।" সুলেখা একটু হেসে উত্তর দিল—, "এই একটু কেনা কাটা করতে দেরী হয়ে গেল কাকা, চল যাই।" এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—, "কে গা বিশু ভায়া—এই মেয়েটি ? বিশু—, "খড়িওপের সরকার বাড়ীর মেয়ে—, মণিমোহন সরকারের ছোট মেয়ে।" বৃদ্ধ—, "বাঃ বেশ মেয়ে !" বলে আবার সুলেখাকে নৌকার মধ্যেই বল্লেন—, "তোমার বাবার'ত সব কটিই মেয়ে—, দিদিদের সব বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?" সুলেখা—, "হ্যাঁ," বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করেলেন—, "কেবল তোমার বিয়ে হতে বাকি ?" সুলেখা—' "হ্যাঁ।" বৃদ্ধ—, "তা তোমার বিয়ের খোঁজ করছেন না—বাবা ?" সুলেখা মুখখানা একটু আরক্ত ও বিরক্তে ভরে গিয়ে উত্তর দিল—, "আমার বাবা আমার বিয়ে দেবে না বলেই আমাকে লেখা-পড়া শিখাচ্ছেন। আমি লেখা-পড়া সেরে যখন উপযুক্ত সময় মনে করবো তখন সে কথা।" বৃদ্ধ—, "সে আবার কি কথা ?" সুলেখা— "কথাটা যেমনই হোক না কেন, কথাটা যখন আমাদের, তখন কথাটা আমাদের মতই হোক না কেন !" বৃদ্ধ সুলেখার কথা শুনে একটু আহত হয়ে চুপ করে গেলেন। দেখতে দেখতে নৌকা এপারের ঘাটে এসে লেগে গেল, সকলে নামতে লাগল ; সুলেখাও পরে নামল। নেমে বিশু মাঝিকে ডাকল, "কাকা শোন !" বৃদ্ধ নেমে ভাবলেন বুঝি তারই কথা বলছে এবং বুঝলেন নৌকাতে সকলের মাঝে তার বিয়ের কথা তাকেই বলা ঠিক হয়নি ভেবে একটু নিজের কাছে নিজেকে আহামুকিতা ভেবে ডেকে বল্লেন—, "মা তুমি কিছু মনে করো না।" সুলেখা—, "না না, আপনি যান—আমরা আমাদের কথাই বলছি।" বিশু কাছে এসে বল্ল—, "কিছু মনে করিস না মা, বুড়ো মানুষ তোদের মত অত ভেবে-চিন্তে কথা বলতে পারে ! হয় ত তোকে পছন্দ হয়েছে।" সুলেখা—, "আরে না না, কাকা— ! আমি ওসব কথা ভাবছি না।" বলেই

একটা কাপড়ের প্যাকেট বিশুর হাতে দিয়ে—বল্ল—, "কাকা! এর ভিতর দুটো ধুতী ও একটা গেঞ্জী আছে, একটা ধুতী ও গেঞ্জী জ্যোতিদার, আর একটা ধুতী তোমার।" বিশু সংকোচে বল্ল—, "এ কি মা, আমায় কেন? আমি ত এখনো শক্ত সমর্থ—, আমার বেটারা.......।" কথা শেষ না হতেই সুলেখা বল্ল—, "কেন? তোমার বেটারা দিতে পারে আর.......আমি তোমার বেটী নই? আমি দিতে পারি না? আমায় তুমি বারোমাস পার করো না?" বিশু—, "পার ত কত জনকেই করি মা! অবিশ্যি তারা ত মাস কাবরা বা বাৎসরকি জজ্‌মানি দেয়, তাই বলে কি সবাই আমার মা হবে? তা যাক্. তা মা তুই জ্যোতিকে দিলেই ভাল হ'তো না? সুলেখা—, "না, যা ভাল তাই করলাম।" বিশু একগাল হেসে বল্ল—, "মা না থাকলি কি আর ছেলের ব্যথা কেউ বোঝে?" বলেই বিশু আবার বল্ল—, "মা আমায় ক্ষমা কর। আমি মিথ্যে কথা বল্লাম। আমার দুটো বেটা দুটো ভাতই দেয় না, তাতে পূজোয় কাপড় দেবে? বলেই কাপড়ের প্যাকেটটা মাথায় তুলে, মাথায় ঠেকিয়ে—বল্ল—, এটা আমার মায়ের দান।' সুলেখা ঘাটের উপরে উঠে দেখল জ্যোতি তখন বটতলায় আনমনে নদীর দিকে মুখ করে বসে আছে। সুলেখা ডাক দিল—, "জ্যোতিদা।" জ্যোতি হকচকিয়ে বল্ল—, "কে? লেখা! কখন এলে? কোথায় গিয়েছিলে ভাই!" সুলেখা—, "একটু ও পারে গিয়েছিলাম, দোকান পাট করতে। এবার বাড়ী ফিরছি। তা তুমি কেমন আছ?" জ্যোতি—, "ভালই আছি—, তবে জান ত অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত—সব সমান। তা যাক—তুমি কেমন আছ?" সুলেখা—, "ভাল! শোন, তোমার জন্যে এই মিষ্টির বাক্সটা এনেছি খাবে।" জ্যোতি হেসে ফেলে বল্ল, "মিষ্টি পেলে কে না খায় বল! তাতে তোমার দেওয়া মিষ্টি আমার কত মিষ্টি।" সুলেখা—, "থাক হয়েছে। সাবধানে থাকবে। পারি ত পুজোর মধ্যে একদিন

আসব।” জ্যোতি—, “বেশ, তবে তুমিও সাবধানে থাকবে। আর মন দিয়ে পড়া শুনাটা করবে—যাতে তোমার মান বজায় থাকে। তুমি ফাষ্ট হয়ে প্রমোশন পেয়েছ জেনে আমার মনটা কত গর্বে ভরে যাবে।” সুলেখা—, “এবার উঠি কেমন!” জ্যোতি—, “আচ্ছা আর বেলাও ত বাড়ছে।” সুলেখা—, “আমিও যাচ্ছি, তুমিও উঠ আর বেলা করো না, ঘরে যাও।” জ্যোতি—, “আচ্ছা।” সুলেখা চলে যেতে জ্যোতি ভাবতে লাগল—, “তার অন্ধকার জীবনে এ কিসের আলো এলো! জীবনে এ কি পরিহাস ঈশ্বর।” এমন সময় বিশু উপরে উঠে জ্যোতির কাছে গিয়ে বল্ল—, “আজ আর দেরী করিস্ না রে, বাড়ী যা আমিও পরে যাচ্ছি।” জ্যোতি—, “কাকা! এই দেখ লেখা মিষ্টি দিয়ে গিয়েছে।” বিশু—, “তা ভালই হ'ল, তুমি খাও।” জ্যোতি—, “কিন্তু কাকা একা আমার নয়, তোমায় দিয়ে তবে খেতে বলেছে।” বিশু—, “আমাকেও মা একটা জিনিষ দিয়ে গিয়েছে—, তাতেও তোমায় ভাগ দিয়ে নিতে বলেছে।” জ্যোতি—, “কি কাকা!” বিশু—, “বলব কেন? বাড়ী গিয়ে বলব।” এমন সময় মদনমালী বল্ল—, “তা তোমরা কি বলাবলি করছ? তা আমার চা খাবে না?” বিশু—, “আর বলিস না দাদা! আমাদের দুঃখীর জীবনের মধ্যে মা এসে একটু আনন্দ দিয়ে গেল।” মদনমালী—, “তা তোমাদের আনন্দ আমাদের ভাগ দেবে না গা!” জ্যোতি—, “নিশ্চয় দেব! “বলেই মিষ্টির ঠোঙ্গাটা বিশু কাকাব হাতে তুলে দিয়ে বল্ল—, “যাও কাকা, এই মিষ্টিগুলো মদন কাকাকে ও তার কাজের ছেলেটাকে দুটো করে আর ঘাটে তোমার ছেলেটাকে দুটো দিয়ে এস। বাদবাকি আমরা বাপ্-বেটাতে মুখে দিয়ে জল খাই।” বিশু তাই করল। মদন কিছুতে নেবে না, বিশুর পীড়াপীড়িতে শেষে বল্ল—; “দাও! অমন আদর করেই বা কে দেয়। কথায় বলে ভালবাসার দান মাথায় নিতে হয়।” বিশু নিজের ছেলেটার হাতেও দুটো দিয়ে এল। মদনের

কাছ হ'তে এক ঘটি জল এনে নিজে কটা মিষ্টি নিয়ে বল্ল, "নে বাবা. এই নে জল, হাত ধো, ছুটো মুখে দে।" জ্যোতি, "তুমি নিয়েছ ত !" বিশু হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বল্ল—, "এই দেখ নিয়েছি।" এমন সময় মদনমালী কাজের ছেলেটাকে দিয়ে দু-ভাঁড় চা ও ছুটো বিস্কুট পাঠাল। বিশু মাঝি পয়সা দিতে গেলে মদনমালী বলে উঠল, "বিশুদা ! আজ আর পয়সা না দিলে, সব সময়ই ত দাও। আজ থাক।" বিশু—, "সে কি হয় !" মদনমালী—, "হয় হয়। আমরা বড় অভাবী, তাই পারি না, তাই বলে কি গোটা জীবনটাই ব্যবসা ? আজ তোমাদের আনন্দে আমাকেও একটু আনন্দ করতে দাও না দাদা ?" বিশু আর কিছু না বলে পয়সা কটা ট্যাঁকে আবার গুঁজে চা-টা খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে বলতে লাগল—, "আজ বাড়ী যা বাপ্, আর দেরি করিস্ নি।" জ্যোতি—, "হ্যাঁ যাই কাকা, এই যাচ্ছি।" বলে জ্যোতিও উঠে তার ঘরের দিকে লাঠি নিয়ে রওনা দিল।

দেখতে দেখতে শারোদোৎসব এসে গেল। গৃহস্থের গোলা-বাড়ী, বার-বাড়ী, গোয়াল-বাড়ী, বসত বাড়ীর উঠান সব গোবর দিয়ে নিকানো। আল্পনায় নতুন রূপ ধরেছে। দেখলেই মনে হয় এটা দৈনন্দিন জীবনের সংসার নয়। একটা অ-পার্থিব আনন্দ-লোকের ছোঁয়া এসে যেন মর্ত্ত-লোক ভরিয়ে দিয়েছে। যে যেমনই হোক, ধনী-দরিদ্র, মুটে-মুজুর, চাষী-চাকুরে, সকলের জীবনে দুর্গা-ষষ্ঠীর ঢাকের শব্দ যে কি স্বর্গীয় আনন্দের শিহরণ জাগায় তা একমাত্র বাঙ্গালী বা প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই অনুভব করতে পারেন। গৃহস্বামী তার পরিবার-বর্গের বিশেষ করে শিশু-পুত্র-কন্যার মুখের হাসিতে নিজেকে ধন্য-কৃতার্থ বলে মনে করেন, যেন মা জগৎ জননী প্রতি ঘরে ঘরে শিশুদের উৎসবমুখর নিষ্পাপ হাসি আনন্দের মধ্যে আনন্দের পরশ ছড়িয়ে আনন্দময়ী হয়ে বিরাজ করছেন। আজ সেই দুর্গা ষষ্ঠী। সুলেখার মা সুলেখাকে ডেকে বল্লেন—,

"আজ ষষ্ঠী, আজ আর অত পড়তে হবে না। একটু সকাল সকাল স্নান সেরে ঘরের দরজার মাথায় ও গোয়াল-ঘরের দরজার মাথায় একটু সিন্দুরও চন্দনের-ফোঁটা দিয়ে আয়। আর আজ ঐ নূতন-লালপেড়ে শাড়ীটা পর। এতক্ষণে সুলেখা তার পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে, চেয়ারটা একটু পিছিয়ে—আরা-মোড়া ভেঙ্গে বল্ল—, "তোমার জ্বালায় বাঁচি না আজ ষষ্ঠী, কাল শুভচনী, এতে কি পড়া-শুনা হয়?" মা—, "ওরে হয় হয়। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে, সব কিছু ধরে রাখার নাম সংসার। আর যে তা না পারে, তাকে দিয়ে আর যাই হোক সংসার হয় না। আর তা না পারলে সে সংসারে আনন্দও থাকে না, সংসার একার নয়, সংসার সকলের। তাই সকলকে তাতে অংশ নিতে হয়। নে—নে, উঠ। অত বড় মেয়ে হ'লি স্নান খাবারের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। আজ ছেলে-মেয়েরা কত সেজে-গুজে কত আনন্দ করে বেড়াচ্ছে, কত কাজ-কর্ম করছে—। আর তুই? ঘরের কোনায় বই মুখে করে বসে আছিস্। নে উঠ! ঐ লাল-পাড় নতুন কাপড়টা পর।" সুলেখা এতক্ষণে মুখটা তুলে উত্তর দিল—, "ওটা কেন! ওটা ত তোমার জন্যে এনেছি।" মা—, "তোমার জন্যেই আনিয়েছি। ওটা তোমার। এবার হ'তে ওটা স্কুলে যাবার কাপড় হ'ল।" সুলেখা—, "না—মা! ওটা আজ তুমি পর, আর আমি বাবার আনা কাপড়টা পরি।" মা—, "যা হয় কর বাপু, আর বকৃতে পারছি না। আমার আর কাজ নেই—বছরকার দিন?" সুলেখার মা চলে যেতে, সুলেখা উঠে স্নান সেরে বাপের আনা নূতন কাপড়টা পরে, ঘরে ঘরে সিন্দুরও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন সময় সুলেখার বাবা ভেতর বাড়ীতে ঢুকেই স্ত্রীকে ডেকে বলছেন—, "দেখ গা! আমাদের ছোট-মা যেন লক্ষ্মী ঠাক্রুণ হয়েছে। কত বড় লাগছে।"

স্ত্রী—, "তুমিই দেখ! অতগুলো মেয়ে পার করলে, আর আজ নতুন দেখছ? তা মেয়ে বড় হচ্ছে না? আর কাপড় পরলে ছোট-

মেয়েকেও বড় দেখায়।" মণিমোহন, "আরে না-না, তুমি এক কথায় সাত-কথা-শোনালে। আমি বলছি মাকে আমায় ঠিক লক্ষ্মী-লক্ষ্মী লাগছে।" স্ত্রী—, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, মেয়েকে নতুন কাপড় পরে ঘুরে বেড়াতে দেখলে সব বাপেরই অমন লক্ষ্মীই লাগে। আর বৌকে ঝাঁটা-ধরে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে দেখলে ঠিক্ 'ঝি-ঝি'-ই মনে হয়।" মণিমোহন লজ্জা পেয়ে বল্লেন—, "তোমার এক কথা, আমি কি তাই বলেছি? তুমি ওসব কর কেন? আমার সংসারে কি লোকজন নেই?" এমন সময় কাজের মেয়েটি হাসতে হাসতে ছুটে এসে সুলেখার মায়ের হাত হ'তে ঝাঁটা গোছাটা কেড়ে নিয়ে বল্ল—, "উঠুন দিদি একটু না হয় দেরী হ'ত! আপনি কেন এসব করতে এলেন?" সুলেখার মা হাসতে হাসতে বল্লেন,—"নে-নে, এর নাম সংসার, সবাইকে সব-কিছু করতে হবে।" মণিমোহন, "তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে?" স্ত্রী—, "আজ আর বেলা বারোটা পর্য্যন্ত বার-ঘরে বসে গল্প না করে, হুঁকো-না টেনে, নেয়ে উঠ।" মণিমোহন সরকার একটু স্বল্পবাক্ ও গম্ভীর স্বভাবের লোক—তবুও হেসে ফেলে বল্লেন—, "আজ্ঞে যো হুকুম্!" বলে হাসতে হাসতে ভিতর হ'তে বার-বাড়ীর দিকে বেরিয়ে গেলেন। সুলেখা গোয়াল-বাড়ী হ'তে ভিতর বাড়ীতে ঢুকে মাকে আর কাজের মাসীকে হাসতে দেখে বল্ল—, "মা—!' এই ত তুমি বেশ হাসতে জান, তবে মাঝে মাঝে অমন মুখখানা ভার করে থাক কেন? এই ত কেমন ভাল লাগছে।" মা—, "না, আমি কি আর হেসেছি? না হাসতে জানি? তোমরাই আমার হাসি কেড়ে নিয়েছ।" এমন সময় সুলেখার মেজদি চিত্রলেখা তার শিশু-পুত্রটির হাত ধরে ঢুকছে। এবং পিছনে তার স্বামী। ঢুকতে ঢুকতেই চিত্রলেখা মায়ের শেষ কথাটি শুনে বল্ল—, "কি হল মা! কে তোমার হাসি কেড়ে নিল? আমরা!" সুলেখার মা পিছনে মেজ জামাইকে দেখে মাথার কাপড়টা একটু বড় করে টেনে—বল্লেন, "এস, বাবা এস। বাড়ীর সবাই ভালত।" সুলেখা হেসে উত্তর দিল, "ঠিক্ হয়েছে। কেবল আমার

দোষ, আমি কাজ করতে পারি না—তাই।” সুলেখার দিদি চিত্রলেখা উত্তর দিল, “ওঃ এই কথা। আমরা এসে পড়েছি, আমরাও করব। বল—তোমার কত কাজ” এই ভাবে পূজার কটা দিন সুলেখার বেশ আনন্দেই কাটছে। তবুও তার মনটা পড়ে আছে আমতা-বেতাই ঘাটের বটতলায়, নয়—অধিকারী মাষ্টারের খড়ের বারন্দায়। সুলেখার ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ভালই কাটল। কিন্তু মহা-নবমীর দিন ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে—, নতুন কাপড়টা কি জ্যোতি পরেছে ! এই আনন্দের জগতে সে ত সব আনন্দ হ'তে বঞ্চিত। হয় পথচারীদের মন-রঞ্জনের জন্য পথের ধারে বসে গান শোনাতে হচ্ছে ; না হয় শত-ঢাকের শব্দে তার বুকটার মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে। আর ঘরের কোণে বসে বসে নিজের অন্ধকার-জগতের মধ্যে নিজেকে হাতড়াচ্ছে। ” মনটা তার বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। তাই সকাল-সকাল উঠে স্নান সেরে একটা সাধারণ কাপড়-জামা পরে মাকে ডেকে বল্ল—, “মা ! আমি আমতায় ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি, আর বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গেও দেখা করে আসছি।' মা—, “তা সকাল সকাল ফিরো, ঘরে দিদি জামাই বাবু আছে। সুলেখা—, “তা-আর আমি কি করব ! তোমরাই আছ।” কথা কটা শুনে সুলেখার মেজদি বল্ল—, “ও কোথায় যাচ্ছে।” মা—, “আমতায় ঠাকুর দেখতে ?” মেজদি—, “তা এ বেলায় কেন ? দিনে দেখতে কি ভাল লাগে। এই সুলেখা ! ও বেলাতে যাস্। আমাদের সঙ্গে যাস, তোর জামাই বাবুও সঙ্গে যাবে।” সুলেখা—, “না, তোরা যাস্। আমি দিনে দিনেই ঘুরে আসি। আর আমি কজন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গেও দেখা করব।” মেজদি—, “বাবাঃ। তুই দেখছি বেশ সাবালক হয়ে গিয়েছিস, বল্লাম—আমাদের সঙ্গে যেতে।” সুলেখা—, “তোমার গারজেন ত তোমার সঙ্গেই থাকবে। আর আমার তোমাদের সঙ্গে যাওয়া না যাওয়াতে—তাতে সাবালক নাবালকের কি আছে ? আর চির দিনই কি নাবালক থাকব।” মেজদি—, “বাবাঃ তোর দেখছি বড় কথা হয়েছে।” মেজ-

জামাই বাবু উত্তর দিল—, "আরে তুমিই বা অমন করছ কেন? ও ছেলে মানুষ, ও-ওর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে বলছে ত!" মেজদি—, "বাবাঃ আমার না হয় অন্যায় হয়েছে।" সুলেখা—, "এতে আবার ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন উঠে কি করে? রাত্রে না গিয়ে আমি না হয় দিনে যাচ্ছি।" সুলেখার মা—, "না হয় তুই রাতেই দিদিদের সঙ্গেই যাস না!" সুলেখা—, "আমি ত আগেই বলেছি, আমার স্কুলের ক'জন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসব। রাতে তাদের বাড়ীতে যাওয়া সম্ভব?" সুলেখার বাবা এতক্ষণে বাড়ীর ভিতর ঢুকে বল্লেন—, "না মা না, তুমি দিনে দিনেই ঘুরে এস্।" সুলেখা আর কথা না বাড়িয়ে কথা কাটাকাটি হওয়ায় মুখটা ভার করেই বেরুল, মা পিছনে ডেকে বল্লেন—, "হাঁ রে! পূজো কালের দিন, নূতন কাপড়টা পরে যা।" সুলেখা একটু রাগত ভাবেই উত্তর দিল—, "না, পুরানোটা কি নতুন ছিল না?" তখন বাবা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বল্লেন—, "না মা না, আজ রাগ করতে নেই। আজ মহা-নবমী আজ রাগ করতে হয়? মা ব্যথা পাবে। আমি এনেছি তুমি কাপড়টা পরবে না?" সুলেখা বাবার কথায় আবার ঘরে ফিরে—বাবার দেওয়া নতুন কাপড়টা পরে যখন বেরুচ্ছে—তখন বাবার চোখে-চোখ পড়তে হেসে ফেল্ল। সুলেখার বাবাও হেসে ফেলে বল্লেন—, "দেখ ত, তোমার মুখে হাসি দেখে আমার কত শান্তি। সেই রকম মা-জগৎ-জননীর কাছে আজ কেউ যদি ছেড়া-ময়লা পরে থাকে—তাঁর মনেও ব্যথা লাগে।" বলে পকেট হ'তে একটা দশ টাকার নোট বার করে মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—, "নাও, এটাতে তোমার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ঠাকুর দেখো।" সুলেখা হাত পেতে নিতে বাবা আবার বল্লেন—, "খুব একটা দেরী করো না—মা।" সুলেখা—, "না-বাবা," বলে চলে গেল, বাপ-বেটীর হাসিতে মা রান্না ঘর হ'তে খুশি হলেন—, কিন্তু তার মেজদি চিত্রলেখার খুশি হল না, বরঞ্চ মুখটা ভারই হ'ল। সুলেখার একক ভালবাসার প্রতিপত্তিতে মনে একটু ঈর্ষাভাবের সঞ্চারই হ'ল।

সুলেখার গন্তব্য স্থল আমতা পূজা-মণ্ডপ নয়, তার লক্ষ্য স্থল বেতাই ঘাট। যাক্—বেতাই ঘাটে এসে সুলেখা দেখল ঘাটের বট-তলায় কেউ বসে নেই। তখন সে অধিকারী মাষ্টারের বাড়ী গিয়ে হাজির। সুলেখা দেখল—, জ্যোতি স্নান সেরে বারান্দায় চেয়ারে বসে একটা কাচা কাপড় পরে—হাত জোড় করে আপন মনে গানের সুরে গুন-গুন করে বলছে—,

বহে আনন্দের স্রোত ধারা—
আজো প্রকৃতি রূপে ভরা—,
কাঁদাস্ যারে—বল মা তারা
তারা কি তোর সৃষ্টি ছাড়া ?

শুনেছি বেদ পুরাণের বাণী
হয়েও তুই অসুর দলনী,
মহিষাসুরেও দিলি চরণ
হেনেও তারে অভয় মরণ।

এতই যদি করুণাময়ী মা !
তবে কেন মোর চোখের জলে
আজ বুক ভাসালি মা—,
মোর তরে কি নেই করুণা !

সুলেখা পিছন হতে হেসে ফেলে বল্ল—, "হ্যাঁ-হ্যাঁ অনেক করুণা আছে। তাই বলে কি কাপড়টা বুকে করে বসে থাকলে করুণা হয় !"

জ্যোতি চমকে উঠে আচম্বিতে বলে উঠল—; "কে ? লেখা !" সুলেখা—, হ্যাঁ, তা তুমি কাপড়টা পরনি কেন ? জ্যোতি—, "তুমি কখন এলে ?" সুলেখা—, "এই, এইমাত্র এলাম। তা আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, কাপড়টা পরনি কেন ? জ্যোতি—, "ওঃ, কাপড়টা ! নিশ্চয় পরব, পরব না কেন, তোমার দান।" সুলেখা—, "দান কেন বল্লে ! আমি কি তোমায় দয়া করেছি ?

তবে এত কষ্ট করে আসি যাই এটার সবটাই কি শুধু দয়া?" জ্যোতি—, "আমি ত তার বেশী ভাবতে পারি না ভাই! তবে আমার প্রতি তোমার অসীম মমতা ও ভালবাসা আছে।" সুলেখা—, "প্রথমের দুটো দেখানোর জন্যে বাড়ীতে সত্য-মিথ্যা বলে এখানে ছুটে আসি না। পরের টার জন্যেই এখানে ছুটে আসি।" জ্যোতি—, "প্রথমের দুটো কি কি?" সুলেখা, "দয়া মমতা।" জ্যোতি—, "শেষেরটা অর্থাৎ ভালবাসা। তবে তুমি আমায় ভালবাস? না না, তা হ'তে পারে না। একটা অন্ধকারের মধ্যে আর একটা আশার আলো জড়িয়ে পরবে এটা হতে পারে না।" সুলেখা—, "কেন হ'তে পারে না।" জ্যোতি—, "তুমি কত বড় ঘরের মেয়ে—, আর তুমি কত ভাল, আর কত বড় হবে—; কত সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠবে— তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের আলোয়। আর কোথায় হারিয়ে যাবে আমার অন্ধকার জীবনে। এ কক্‌খনো হ'তে পারে না। হওয়া উচিৎ নয়।" সুলেখা—, "একটা অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর-দীপই থাকা শোভা পায়, এবং সেটাই উচিৎ। আর মধ্যাহ্নে সূর্য্যের তীব্র আলোতে যদি প্রদীপ জ্বলে, তা শুধু অশোভন নয়— উপহাসেরও, এবং তার জন্যে সে সৃষ্টি নয়; অন্ধকার গৃহে যেখানে আলো নেই, সেখানে আলো দানের জন্যেই তার জন্মের সার্থকতা।" জ্যোতি—, "এ তোমার মহত্ত্বের কথা, আদর্শের কথা, আবেগের— কথা লেখা! বাস্তব বড় কঠিন। সেখানে আদর্শ ও বাস্তবতা মিল খায় না।" সুলেখা—, "যে আদর্শ কোন দিন বাস্তবতার সঙ্গে মিল খায় না তা অবাস্তব-আদর্শ, যা কোন দিন সত্যে বা মূর্তিতে মুর্ত্ত হয় না তাকে সত্যের আদর্শ বলে না। সে শুধু আদর্শের সুখ-বিলাস মাত্র। যে আদর্শ রূপ পায় যা রূপ দেওয়া যায় তাকেই আদর্শ বা সত্য বলে। আমার জীবন ও আদর্শ এক, আমি সত্যের পূজারী আমি গল্পের বই-এর পাতায়—, আর সিনেমার পর্দায় বা যাত্রা

নাটকে আদর্শকে দেখে হাততালি দিতে শিখিনি। জীবন দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে জানি। তা সে যতই কঠিন হোক না কেন?" জ্যোতি—, "তুমি ছেলে-মানুষ লেখা! তুমি ভাবতেও পারছ না আদর্শ ও সত্যকে জীবনে আলিঙ্গন করা কত কঠিন। তার চাইতে আমি তোমার বন্ধু হয়ে থাকি।" সুলেখা জ্যোতির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিল—, "এতে কি আমর মান বাড়বে? তাতে লোক কি বলবে? সমাজ লোকচক্ষু বলেত কথা আছে? জ্যোতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিল—, "না তা নয়, তুমি সংসার করবে, তোমার স্বামীও আমার বন্ধু হবেন।" সুলেখা—, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—, "তুমি পুরুষ-মানুষ—, তুমি বোঝ না পুরুষের মন কত সন্দেহপরায়ণ? আর তুমি তা বুঝবেই বা কি করে? তোমার চোখে ত রূপ আর রং-এর কোন মায়াজাল নেই। আমার স্বামী কক্‌খনো বিশ্বাস করবে না যে, তুমি আমার নিছক বন্ধু, তোমার প্রতি আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। আরো প্রশ্ন তুলবে—, নিছক্‌ই কি একজন অন্ধজনের প্রতি এত দয়ামায়া মমতা ইত্যাদি। তাতে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার ভালবাসার বিশ্বাসের চিড় ধরবে আর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বেও ফাটল ধরবে।" জ্যোতি—, "তুমি কত যুক্তিবাদী, কত চিন্তাশীল, কত সুদূর প্রসারী তোমার চিন্তা-ধারা। তা তোমার বাবাই বা কেন আমার মত একটা অন্ধের হাতে তোমাকে তুলে দেবেন? এটাও কি সম্ভব?" সুলেখা—, "তার জন্যে আমি তৈরী হচ্ছি। আমি স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করছি, যাতে সেই মুহূর্তে সকল বাধা বিপত্তি ও আপত্তির মোকাবিলা করে আমার সত্যে ও আদর্শের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।" জ্যোতি—, "লেখা তোমায় কি বলে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব, তুমি কত বড় কত সুন্দর। একটু আমার কাছে এস্‌।" সুলেখা কাছে যেতে জ্যোতি সুলেখার হাতখানা ধরে তার বুকে চেপে বল্ল—, "আজ আমার অন্ধ-জীবন ধন্য, তুমি অনেক বড় হও লেখা, তুমি

অনেক অনেক বড় হও বন্ধু।" সুলেখা হেসে ফেলে বল্ল—, "নাও খুব হয়েছে—, এবার এই কাপড়টা বুকে করে না থেকে পরে দেখাও দেখি," বলে কাপড়টা খুলে জ্যোতির হাতে দিল। জ্যোতি কাপড়টা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে কাপড়টা পরে বাইরে এসে হাসতে হাসতে বল্ল—, "এবার খুশি ত।" সুলেখা— নূতন গেঞ্জীটাও পর।" জ্যোতি— "বেশ দাও।" সুলেখা ঘরের মধ্যে হ'তে নূতন গেঞ্জীটা বের করে এনে জ্যোতির হাতে দিল। জ্যোতি নূতন গেঞ্জীটা পরে বল্ল— "এবার হয়েছে তো ?" সুলেখা— "এই নাও, এই মিষ্টিটা মুখে দাও।" বলে মিষ্টির প্যাকেটটা জ্যোতির হাতে দিল। জ্যোতি বল্ল— "আমি একা খাব ? আজকের দিনে তুমিও নাও।" সুলেখা দুটো মিষ্টি তুলে নিয়ে বল্ল— "এই নিলাম, এবার তুমি নাও।" বলে জল এনে দিল। জ্যোতি দুটো মিষ্টি তুলে মুখে দিয়ে জলের গ্লাসটা হাতে নিতে সুলেখা জানাল— "এবার যাই। অনেক বেলা হ'ল। স্কুল খুললে আবার দেখা হবে।" জ্যোতি— "এস। মন দিয়ে পড়ো। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে।" সুলেখা "আচ্ছা," বলে উঠে তার বাড়ীর দিকে রওনা দিল। সুলেখা চলে যেতে জ্যোতি আপন মনে ভাবতে লাগল, "এ কি সত্য হ'তে পারে ? এ অসম্ভব, এ লেখার খেয়ালী আবেগ-চঞ্চল মনের উচ্ছ্বাস।" তবুও তার মনে এই বলে সান্ত্বনা পাচ্ছে—, "তবুও আমি ধন্য। এই ছোঁয়াটুকু নিয়েই আমি চোখের জলে সুরের মধ্যে লেখাকে গানে গানে, সুরে সুরে, ধরে রাখব। সারাজীবনে জীবন-স্মৃতির স্মৃতির ধূপ করে ধরে রাখব—।" বলেই আপন মনে গাইতে লাগল—

এইরূপে আমি নাই বা এলাম—,
এইরূপে তোমায় নাই বা পেলাম
তবু রূপের মাঝে অরূপ রবে
চাওয়া পাওয়ার ছোঁয়ার বাহিরে।

এমন সময় বিশু মাঝি এসে বল্ল— "হ্যাঁরে খাবি না? দেখ ত কত বেলা হয়ে গেল। তোর আর দোষ কি? তোকে দিলে ত খাবি! আমাদের জীবনে কিবা মহাষষ্ঠী কিবা মহানবমী। আমরা চির-দিন দশমীতেই আছি। ঘাট কি আমায় ছাড়বে? আমি ঘাটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘাট আমায় ছাড়বে না। নে বাবা, দুটো মুখে দে। আমি দুটো মুখে দিয়ে গেলে তবে ছেলেটা আবার দুটো মুখে দিতে যেতে পারবে।" জ্যোতি— "তোমাদের আমি সকলের কি বোঝা কাকা, না হয় আর একটু দেরী হ'ত। এত ব্যস্ত হয়ে এলে কেন?" বিশু— "নে নে, বাবা, অমন কথা বলতে নেই। তোরা আমাদের ছেলে, আজ লোকের ছেলেদের কত আনন্দ—, আর আমরা দুটো ভাতও সময়ে খেতে পাই না।" জ্যোতি—, "কাকা—, খাবার থাক, তুমি বরঞ্চ দুটো খেয়ে ঘাটে যাও। নইলে রতন ছুটী পাবে না। সে বেচারীও কষ্ট পাচ্ছে। ঘাটে বুঝি আজ খুব ভিড়।" বিশু— হ্যাঁ বাবা, আজ কাল দুটো দিনই ভিড় সামলাতে হবে।" জ্যোতি—, "তবে তুমি দেরী করো না যাও।" বিশু—, "তবে তুই দুটো খেয়ে নিস্, বাপ্।" বলে বিশু চলে গেল।

এদিকে দেখতে দেখতে দুর্গা-নবমী দশমী ও কোজাগারী-লক্ষ্মীপূজা সব পরব পেরিয়ে ভাই-দ্বিতীয়ার পর সুলেখার স্কুল খুলেছে। সুলেখা পূজা বন্ধের পর আজ প্রথম দিন স্কুলে যাচ্ছে।

তাই আজ একটু সকাল সকাল সে বাড়ী হতে বেরিয়েছে। আজ এ-এক অন্য সুলেখা।

আজকের সুলেখার উচ্ছল হাসি আজ সংযত ও গম্ভীর। আজকের সুলেখার চালে-চলনে বেশ মাপা ও হিসাবী ভাব লক্ষ্য করা যায়—। আজকের সুলেখার দৃষ্টি স্থির ও একটি নির্দিষ্ট স্থির-লক্ষে পৌঁছানোর দৃঢ় সঙ্কল্পের যাত্রা।

যেন ভরা ভাদরের ঢোলো-বেনো নদীর স্রোত তার গতি-পথের দু-কুল ছাপিয়ে যত্র-তত্র ডুবিয়ে-ভাসিয়ে, ভেঙ্গে-গড়ে, ধুয়ে-

মুছে, ভরা বর্ষার পর শান্ত সংযত তার বরফের হৃদয় গলান নিজস্ব স্বকীয় স্থায়ী প্রবাহে চলছে। তার লক্ষ্য একমাত্র সাগর-সঙ্গম। এ চলার গতিপথের দিকে তার লক্ষ্যই নেই, পথের দু-কূলে কি ভাঙ্গবে আর গড়বে। কি ভাসাবে আর কি ডোবাবে! ভাঙ্গা-গড়া, ডোবান-ভাসানোর পালা আজ তার শেষ। আজ তার চলার গতিপথের একটাই লক্ষ্য—'সাগর'। সাগর-সঙ্গমে নিজেকে বিলিয়ে মিশিয়ে সাগর হওয়া।

সুলেখার আজ বহু আত্ম-সমালোচনার ও চিন্তা ভাবনার পর কৈশোরের স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চল-চপলতার উচ্ছলতাকে আত্মস্থ করে, নব-যৌবনের আবেগকে শান্ত সংযত ও স্থির করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে এগিয়ে চলার নিরব-মৌন সঙ্গীতের বেগবান গতির আহ্বান। এ চলার মন্ত্র—, দুঃস্থ-জনে দেহ-প্রাণ, অন্ধ জনে দেহ আলো।" এ চলার সঙ্গীত—, "আমার আমি রে দিয়েছি বিলায়ে—তোমারি গানে গানে।"

সুলেখা মন্থর গতিতে বেতাই ঘাটে এসে দেখল, বটতলায় জ্যোতি গান ধরেছে—,

পিলু-খাম্বাজ

"তোমায় নূতন করে পাব বলে—
হারাই ক্ষণে ক্ষণ ও আমার ভালবাসার ধন।
দেখা দেব বলে তুমি হও যে অদর্শন—
ওগো তুমি আমার নও আড়ালের তুমি আমার চিরকালের—,
ক্ষণকালের লীলা স্রোতে হও যে নির্গমন—
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন—,
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাই তাই শূন্যে সে যে শেষ করে দাও আপনাকে—
ঐ হাসি যে দেয় ধুয়ে মোর, বিরহের রোদন।"

গান শেষ হ'তে অনেকেই আহা আহা করতে করতে যে যাঁর দু-চার পয়সা দিয়ে চলে যেতে সুলেখা একটা চাপা-দীর্ঘ-শ্বাস ছেড়ে কাছে এসে বল্ল—,"জ্যোতিদা! আজ আমার স্কুল খুল্ল। তুমি ভাল আছ ত!" জ্যোতি—, "লেখা! তুমি কেমন আছে ?—আমি ? আমি আগের চাইতে অনেক ভাল, অনেক ভাল আছি ভাই। বেঁচে থাকার অনেক-অনেক, আশার-আলো, অনেক আত্ম-শক্তি পেয়েছি। ভালই আছি! তা তুমি কেমন আছ ? পরীক্ষার জন্য তৈরী হোচ্ছ ত!" সুলেখা—, 'হ্যাঁ—পরীক্ষা সামনেই—, বন্ধের আগেই পরীক্ষার রুটীং দিয়ে দিয়েছে। এখন আর বিশেষ দেখা না হ'লে কিছু মনে করো না। আমার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত থাকব। আর পরীক্ষার মধ্যেও ব্যস্ত থাকব। পরীক্ষার শেষে তোমার ঘরে গিয়ে আবার দেখা করব কেমন ? জ্যোতি—, ''না-না, তোমায় না দেখতে পেয়ে কিছু মনে করব কেন ? আমি ত জানি এখন তুমি কত ব্যস্ত। আর কি জানো ? যাঁদের চোখে আলো-আছে, তাঁরা তাদের প্রিয়জনকে মনে করবার জন্যে যখন কাছে—না পায় তখন চোখ-বুজে অন্ধকারে খোঁজেন। আমার চোখ বুজে আর অন্ধকার করে খুঁজতে হয় না। অন্ধকারেও একটা আলো আছে, যেখানে মনে করলেই—আমার আলোয় আমি তাকে আমার মনের মত করে দেখতে পাই।" সুলেখা—, "বেশ! তাই দেখো, আমি চলি। ঐ পিছনে আমার ক্লাসের বান্ধবীরা আসচে।' বলেই ঘাটে নামছে, এমন সময় বিশু মাঝি ঘাট হ'তে উপরের দিকে ওঠে আসছে—, সুলেখার সঙ্গে চোখে-চোখ পড়তেই—বলে উঠল—, "এই যে—মা আমার, আজ তোমার ইস্কুল খুল্ল—মা।". সুলেখা—, "হ্যাঁ—কাকা। তুমি কেমন আছ ? ভাল ত!" বিশু—, "হ্যাঁ-মা, ভাল। তা তোমরা সব ভাল ত ? সুলেখা—, ''হ্যাঁ—কাকা!" বলেই তার বই-এর ভাঁজ হ'তে পনেরোটা টাকা বার করে বিশুর হাতে দিয়ে বল্ল—, "কাকা, এই টাকা কটি রাখ।" বিশু সঙ্কোচে,

'কেন মা, টাকা কি হবে?" সুলেখা— "রাখ ত। কতই বা দিতে পারি? যখন যা পারি নিও। এই টাকা কটায় অন্ততঃ চালটাও কিনে রেখো। দেখ—আমি ত এখনো উপায় করি না!" বিশু—, "না-না মা! আমি ত জানি তুমি তোমার হাতখরচা ও টিফিনের খরচ হ'তে দাও। তা এত কষ্ট কেন কর মা— আমি যা খাই তা থেকেই এক মুঠো জ্যোতি খাবেখন।" সুলেখা—, "আমি আর কি দিই! তুমিই ত দেখ। তবে যখন যা-পারি দিতে চেষ্টা করব নিও।" এমন সময় সুলেখার বান্ধবী অনিতা ছুটতে ছুটতে এসে সুলেখাকে জড়িয়ে ধরে বল্ল—, "বাবাঃ তোকে কত ডাকছি, শুনতেও পাস না। আর আজ কত আগে এসেছিস্?" সুলেখা—, "না—, শুনতে পায়নি ভাই, আর আজ একটু আগেই এসেচি—কতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা, একটু গল্প করব বলে।" অনিতা খুশিতে গদ্-গদ্ হয়ে বল্ল—, "চ্-চ্, ও পারে গিয়ে গল্প করি।" বলেই ওরা খেয়ায় উঠল, কিছুক্ষণের মধ্যে বিশু মাঝির ছেলে রতন খেয়া ছেড়ে দিল।

এইভাবে দু-চার দিন ক্লাস করার পর সুলেখা আর স্কুলে না গিয়ে একেবারে প্রথম পরীক্ষার দিন হ'তে শেষ পরীক্ষা দিয়ে তার পরের দিন সকালে জ্যোতির বাড়ীতে দেখা করতে এল। জ্যোতি সেদিন সকাল সকাল স্নান সেরে একটু পরিপাটি হয়ে তার বারান্দায় টেবিলে বসে বসে তার একটা গোপন খাতা পেনসিল নিয়ে কি যেন আপন মনে সাদা পাতায় আন্দাজে আন্দাজে লিখে যাচ্ছে। সুলেখা এমন সময় চুপি চুপি পিছন দিক্ হ'তে পা টিপে্ টিপে্ এসে সাবধানে জ্যোতির চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল। সুলেখা দেখছে জ্যোতি খাতায় কি যেন লিখে যাচ্ছে। সুলেখার বিস্ময়ের অন্ত নেই, তাহলে জ্যোতি কি লিখতে জানে! কি করে শিখল! তবে কি জ্যোতি জন্মান্ধ নয়! তা হ'লে কি জ্যোতি আমাদেরই মত লেখা-পড়া করতে করতে চোখ হারিয়েছে? যত বিস্ময় তত

আনন্দ হচ্ছে সুলেখার অন্তরে। "জ্যোতি তা হ'লে জ্ঞানের জগতে একেবারে অন্ধ নয়। ও লিখতে বা মনের কথা কাউকে লিখে জানাতে পারবে।"—সুলেখা ভাবছে—, "দেখি ত কি এমন লিখছে, কাকে লিখছে ?" সুলেখা দেখল—একটা কবিতা—লিখছে আপন মনে।

চাওয়া পাওয়া ? নাইবা হ'ল,
পেয়ে তারে নাইবা হারাল— !
যারে তুমি পাওয়া বল—
না পাওয়া যে—তারও বড় !
সে যে—না পাওয়ারি মন ভরাল।

সুলেখার আর সহ্য হ'ল না। কবিতাটি শেষ করতে না দিয়েই পেছন হ'তে কবিতার খাতাটা টেনে নিয়ে তার বুকে চেপে ধরে বল্ল—, "তাহলে তুমি শুধু সু-গায়কই নও, কবিও বটে। তা তোমার এত ভয় সংকোচ কেন ? তুমি কি বিশ্বাস করতে পার না ? পাছে তোমার চেয়ে না-পাওয়ার ব্যথা মনকে যন্ত্রণা দেয়—, তাই তোমার "চাওয়াকে" না-পাওয়ার ভয়ে তাকে চেয়ে হারানোর চাইতে, না পাওয়ার স্মৃতিটুকু নিয়ে মনকে ভরাতে চাও !" সুলেখা হেসে ফেলে আবার বল্ল—, "তোমার কথাকটি বড় খাঁটি। পার্থিব বস্তু বা প্রিয়জনকে পেয়ে হারানোর চাইতে বা তিক্ততায় শেষ হওয়ার চাইতে বরঞ্চ চেয়ে না পাওয়ার মাঝে চির-চাওয়া বা পাওয়ার চাতক-তৃষ্ণার মধুময়-স্মৃতির করুণ সুর হয়ে বাজুক। বেশ ! কিন্তু তুমি কি ভাবতে পার না—আমি তোমার চোখের আলো হয়ে তোমার চোখেই আছি !" জ্যোতি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উত্তর দিল—, "কে—লেখা ? না না, লেখা, তা না ! তবে আমার চাওয়া বা আশা যে বড় দুরাশা তাই ! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো।" সুলেখা—, "তুমি কি শোননি নারায়ণ বামনের রূপ ধরেই চাঁদে অর্থাৎ স্বর্গে পর্যন্ত তাঁর পদ-দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন।

সেদিন চাঁদ-ই বামন-রূপের কাছে ধরা দিয়েছিল।” আবার হেসে ফেলে বল্ল—, “আজ চাঁদ তোমার ঘরে ঢুকেছে বিশ্বাস হচ্ছে না!” জ্যোতি—, “হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে, তুমি আমার ভাঙ্গা-ঘরে এসেছ বলেই আমার এত আনন্দ!, এত খুশি! কিন্তু ভাবতে পারি না একি সত্যি! হতে পারে? না স্বপ্ন?” সুলেখা—, সত্যি, সত্যি, সত্যি!” জ্যোতি—, “তোমার পরীক্ষা কেমন হ'ল লেখা?” সুলেখা—, “ভাল। তা তুমি লেখাপড়া জান! তা কই এতদিনেও ঘূণাক্ষরেও টের পেতে দাও নি ত। জানতাম্ তুমি লেখাপড়া জান না। তোমার হাতের লেখাও সুন্দর এবং কত সুন্দর তোমার কবিতার মর্মকথা। এই ত তোমার কবিতার খাতার পাতা উল্টে দেখছি কত কবিতা! কি সুন্দর তোমার লেখা! কি করে চোখ হারালে এবং তখন কোন্ ক্লাসে পড়তে?” জ্যোতি—, “ওসব শুনে কি হবে! সে-সবদিন আমার ব্যথার স্মৃতি মাত্র।” সুলেখা—“যদিও তোমায় ব্যথাই দেব—, তবু আমার বড় শুনতে ইচ্ছা করছে। বল না!” জ্যোতি সংক্ষেপে বলে গেল তার জীবনের হারানো দিনের কথাগুলো। সে ভাবতেও পারেনি তার জীবনে এমন ঘন-অন্ধকার নেবে আসবে। আর অন্যের অনুগ্রহে বা পথে বসে গান শুনিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। সুলেখা সব শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—, “আমি তোমায় পথ হ'তে কুড়িয়ে নিয়েছি এবং তা আর পথে হারাতে দেব না। একটু অপেক্ষা কর, আর কটা বৎসর, আমায় একটু দাঁড়াতে সুযোগ দাও।” আবার একটা টানা-নিঃশ্বাস ফেলে জ্যোতির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বল্ল—, “তাহ'লে তোমার জীবনেও একদিন আলো ছিল, একদিন আর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মত স্কুলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্যতা নিয়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর মত বৎসর বৎসর প্রমোশন পেয়ে ক্লাসে উঠতে। জানি না এসব ঈশ্বরের দেওয়া কষ্ট না মানুষের অজ্ঞতা বা হৃদয়-হীনতার ফল। তবুও ভাগ্য বলে সব দোষ ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে

মানুষ অ-মানুষ হয়ে বসে থাকবে? যাঁর আলো আছে—সে কি অন্ধজনে আলো দেবে না? যাঁর প্রাণ আছে সে কি দুস্থ জনে প্রাণের ছোঁয়া দেবে না? না—তা হ'তে পারে না। এ হওয়া উচিৎ নয়। না! জ্যোতি—এ আমার দয়া নয়, এ আমার পূর্ণতা! এ আমার শুধু মায়া নয়, মনের মণিকোঠার সাধনা! তোমার মাঝে আমার পূর্ণতাকে ফুটিয়ে তোমার পূর্ণতাকে করব সার্থক। তুমি সুর-লোকের লোক—, সুর-সাধক, তুমি আনন্দলোকের লোক—কবি। তোমাকে আমাদের মর্ত্তের স্বার্থপরতার নিছক অবজ্ঞায় হারাতে দেব না।" বলে জ্যোতির হাতখানা ধরে সুলেখা আবার বল্ল—, "এই তোমায় আমি কথা দিলাম।" জ্যোতিও সুলেখার হাতখানা দু-হাত দিয়ে সরিয়ে ধরে যেন মৃদু-বিদ্যুৎ-প্রবাহ-শিহরণে—, আবেশে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—, "লেখা!" সুলেখাও যেন আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় অবশ আবেশ জড়ানো কণ্ঠে উত্তর দিল—, "জ্যোতি! তুমি তুমি কি বোঝ না! আমি কেন তোমার কাছে ছুটে আসি? এর সবটুকুই কি নিছক দয়া-মায়া-মমতা! আর কিছু কি নেই? জ্যোতি ও সুলেখার হাত দুটো দু-জনের হাতের মধ্যে তখন মৃদু-কম্পনে কাঁপছে। জ্যোতি উত্তর দিল—, "আমি জানি লেখা! তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু এ কি কোন দিন বাস্তবে রূপ পাবে? না পাওয়া সম্ভব!" সুলেখা উত্তর দিল—, "অসম্ভব বলে কিছু থাকে না—যখন ঐকান্তিকতা ও আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে একাগ্রতা থাকে। আমি ত তোমায় স্বার্থ দিয়ে চাইনি, তোমার ভালবাসার আদর্শ ও নিষ্ঠা দিয়ে পেতে চাই। সে আমার প্রেমের দীপে আমি সলতে—, তুমি তার জ্যোতি হয়ে জ্বলবে।" জ্যোতি হেসে উত্তর দিল—, "না-না, ঠিক তার উল্টো; আমি তোমার প্রেমের আঁধার, মানে প্রদীপ মাত্র। আর তুমি সেই দীপের জ্যোতির শিখা। তোমার আলোয় ধন্য হবে এ প্রদীপের শূন্য হৃদয়।" সুলেখাও হেসে ফেলে বল্ল—, "বাঃ! তুমি ত বেশ সুন্দর কথা বলতে জান।

আর পারবেই বা না কেন? হাজার হ'লেও তুমি কবি।" জ্যোতি কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বল্ল—, "লেখা—! তোমারই ত খাই, আজ তুমি একটু কিছু মুখে দাও না!' সুলেখা—, "কি আছে তোমার ঘরে?" জ্যোতি—, "আমার আর কি থাকবে বল! দুটো নাড়ু রেখেছি।" সুলেখা হেসে ফেলে উত্তর দিল—, "তুমি নাড়ু কোথায় পেলে?" জ্যোতি—, "বাড়ীতে দুটো নারকেলের গাছ আছে,— বিশু কাকা পূজোর আগে নারকেলগুলো পাড়িয়ে বিক্রি করার সময় আমি ঘরে গোটা দশেক রেখে পরে তা কাকাকেই দিয়ে দিয়েছিলাম। কাকা তাই অনেকগুলো নাড়ু করিয়ে একটা বয়ামে রেখে দিয়েছি। আনো না ঘরের ভিতর হ'তে।" সুলেখা—, "আচ্ছা আচ্ছা! আনছি। তবে এবার কিন্তু আমি যাব। অনেকক্ষণ হ'ল এসেছি। আর বিশু কাকারও দোপরে তোমার খাবার আনার সময় হয়ে এল।" জ্যোতি—, "তা হোক! কাকা ত জানেই— তুমি আমায় ভালবাস।" সুলেখা—, "তা হ'লেও দুপুরে তোমার এখানে আমার এতক্ষণ উপস্থিতি তাদের মনে নানা প্রশ্নের উঁকি দিতে পারে। সে সুযোগ দেব কেন? বল! অহেতুক কারো সমালোচনা করার সুযোগ দিতে নেই।" বলতে বলতে সুলেখা ঘরের ভিতর হ'তে নারকেলের নাড়ুর বয়ামটা বের করে একটা প্লেটে গোটা দশেক রেখে বাদ-বাকি ঘরে রেখে এক গ্লাস জল এনে জ্যোতির সামনে টেবিলে রেখে বল্ল—, "নাও খাও।" জ্যোতি—, "আমি ত খাই-ই এটা তোমার জন্যে রেখেছি।" সুলেখা—, "এই নাও—আমি নিলাম, এবার তুমি নাও।" বলে গোটা কতক মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে আবার জ্যোতির জন্য জল এনে বল্ল—, "জানো, আজ আমার ওয়ার্ক-এডুকেশন আছে বলে মাকে বলে এসেছি। যদিও খাতাগুলো জমা দিয়ে চলে এসেছি তবুও একটু ছুতো না করলে ত তোমার কাছে এসে এতক্ষণ সময় দেওয়া সম্ভব নয়। এবার আসি। আবার প্রমোশন নিয়ে তোমায় মিষ্টি খাইয়ে যাব—

কেমন ?" জ্যোতি—, "তুমিই আমার মিষ্টি, তোমার কথায়, তোমার আশ্বাস বাণীতেই আমি স্বর্গ রচনা করি আমার এতেই সুখ, আমার এতেই আনন্দ। তার উপর মিষ্টি, সে আরো মিষ্টি।" সুলেখা, "বেশ বেশ! অনেক বেলা হল আজ, আজ আমি আসি কেমন ?" জ্যোতি—, "এসো ভাই! সাবধানে থেকো।" সুলেখা 'আচ্ছা' বলে বাড়ীর পথের দিকে রওনা দিল।

দেখতে দেখতে সুলেখার প্রমোশনের সময় হয়ে এলো। ২৪শে ডিসেম্বর সুলেখার প্রমোশন। ২৫শে ডিসেম্বর বড় দিনের ছুটী এবং ২রা জানুয়ারী আবার নতুন মাস আরম্ভ হবে। সুলেখার আত্ম-বিশ্বাস আছে সে অবশ্যই প্রমোশন পাবে তবে কোন স্থান নেবে সেটা আগে হতে বলা ঠিক্ নয় বা বলা যায় না। প্রমোশনের দিন সুলেখা পূজার কাপড়টা পরে বেশ ছিম্-ছাম্ হয়ে একটু আগেই স্কুলে এসেছে। বাড়ীতে মা ও বাবা সকলেই জানেন মেয়ে নিশ্চয়ই পরীক্ষায় ভাল ফল করবে, তাই বাড়ী হ'তে বেরোবার সময় মাকে বলে এসেছে—, "মা, যদি ফিরতে দেরী হয় ত চিন্তা করো না। আমি বান্ধবীদের সঙ্গে হয়ত সিনেমায় যেতে পারি।" মা সম্মতি দিয়ে বলেছেন—, "খুব একটা দেরী করো না।" সুলেখা, 'আচ্ছা' বলে চলে এসেছে। সুলেখা নবম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে প্রমোশন পেয়ে, খুশিতে এটা-সেটা কিনে এবং জ্যোতির জন্যে একটা ভাল পেন ও একটা ভাল বাঁধানো ডায়েরী খাতা কিনে এবং একটু মিষ্টি কিনে সকলকে এড়িয়ে এক ফাঁকে জ্যোতির ঘরে এসে হাজির। জ্যোতি ঘরের বারান্দায় তক্তাপোষে শুয়েছিল। সুলেখার উপস্থিতি বুঝতে পেরেই উঠে বসে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—, "কে? লেখা? তুমি কি হলে?" সুলেখা,— "প্রথম!" জ্যোতি আনন্দে দু'হাত কপালে তুলে প্রণাম করে বল্ল—, "মা সরস্বতী! তুমি চিরদিন লেখার কণ্ঠে বাস কর। আমার লেখা চিরদিনই যেন প্রথম থাকে।" সুলেখা হেসে

ফেলে বল্ল—, "তোমার লেখা! তাহ'লে লেখা এবার তোমার হোল?" "জ্যোতি একটু লজ্জা পেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দিল—, "মানে, মানে যাকে স্নেহ,—ভালবাসা যায়—সে ত তারই।" সুলেখা—, "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি এটাই শুনতে চেয়েছিলাম। এতে আবার আম্‌তা-আম্‌তা করে ঢোক গিলে, আবার ঢাকা-ছাপার কি আছে? তোমার সঙ্কোচ আর গেল না। তা—আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম, এসেছি।" জ্যোতি—, "আমার মিষ্টি!" সুলেখা—, "কোথায় আমি মিষ্টি খাব, আর তুমি আমার কাছে মিষ্টি খাবে বলে ঠিক্ বসে আছ?" জ্যোতি—, "কি করব বল। গঙ্গাদেবীকে ত তার জলেই পূজা করতে হয়।" সুলেখা, "বেশ নাও তোমার মিষ্টি।" বলে মিষ্টির বাক্সটা জ্যোতির হাতে দিল। জ্যোতি সুলেখাকে বল্ল—, "আমার হাতে একটু জল দাও।" সুলেখা হাতের খাতা ডায়েরী ও পেনটা টেবিলে রেখে হাত ধুয়ে বল্ল—, "লেখা। কই আমার আনন্দের ভাগ নাও, কাছে এস।" সুলেখা কাছে যেতে জ্যোতি সুলেখার হাত ধরে তার হাতে সুলেখার দেওয়া সন্দেশ দিয়ে বল্ল—, "এটা আমার খুশির প্রতীক, তুমি আগে নাও।" সুলেখা হাত পেতে জ্যোতির দেওয়া মিষ্টি নিয়ে বল্ল—, "বল ত তোমার জন্যে কি এনেছি?" জ্যোতি—, "আমার জন্য তোমার এই শুভ খবর ও আমার বুক-ভরা আনন্দ এনেছ।" সুলেখা—, "ধুৎ। শুধু কি তাই? এই দেখ একটা সুন্দর পেন ও আর একটা ডাইরী খাতা। এতে তুমি তোমার কবিতা লিখবে।" জ্যোতি—, "বেশ। কিন্তু আমি কি করে তোমার এই সুন্দর পেন দিয়ে সুন্দর করে ঐ সুন্দর খাতায় লিখব? বাঁকা ত্যাড়া হয়ে যাবে না?" সুলেখা—, "না। যদি ঐ ছেঁড়া খাতায় বাঁকা-ত্যাড়া না হয় তবে এখানেও হবে না।" বলে খাতা পেন জ্যোতির হাতে দিল। জ্যোতি খাতা পেন বুকে চেপে ধরে একবার চুম্বন করে টেবিলে রাখল। খানিক চুপ থাকার পর সুলেখা বল্ল—,

"কই তুমি সন্দেশ খেলে কই ?" জ্যোতি—"তুমি খেয়েছ ?'' সুলেখা—, "এই দেখ খাচ্ছি।" জ্যোতি—, "দুটো কাকার জন্যে রাখ। কাকা তোমার এই খবরে খুব খুশি হবে।'' সুলেখা—, "দুটো রাখ, এই নাও আমিই তুলে রাখছি—, এবার তুমি নাও।'' বলে কটা সন্দেশ বিশু কাকার জন্যে তুলে রাখল। জ্যোতি ও সুলেখা মিষ্টি মুখ করল। জ্যোতি জল খেতে খেতে বল্ল—, "লেখা! তোমায় অনেক বড় হ'তে হবে। বৎসরের প্রথম হ'তেই মন দিয়ে পড়া-শুনা কর।" সুলেখা—,"তাই ভাবছিলাম, যদি আমায় দীর্ঘ দিনও দেখতে না পাও তবুও ভুল বুঝো না। আমি তোমারই জন্যে যাতে এগিয়ে যেতে পারি তার চেষ্টা করব। যাতে আমরা দিন পাই—যে দিনে—আর কারো কাছে কোন জবাব দিতে না হয়।" খানিক চুপ করে আবার বল্ল—, "বোঝই ত! জীবনযুদ্ধে নাবতে হ'লে আগে পায়ের তলার মাটি শক্ত ভিতে রাখতে হয়, এবং আত্ম-শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে তবে এগুতে হবে।"

জ্যোতি—, "আমি ত তোমার বোঝা, যা করবার তুমিই কর। আমি শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব—তুমি অনেক অনেক, বড় হও; ঈশ্বর তোমার সহায় হোন্।"

এমন সময় বিশু-মাঝি একটা বড় টিফিন-কৌটায় করে জ্যোতির জন্যে দুপুরের খাবার নিয়ে এল। সুলেখাকে জ্যোতির বারান্দায় বসে থাকতে দেখে বল্ল—, "মা, তুমি কখন এলে ?" সুলেখা উত্তর দেবার আগেই জ্যোতি উত্তর দিল—, "কাকা, লেখা প্রথম হয়ে প্রমোশন পেয়েছে। তাই আমাদের মিষ্টি-মুখ করাতে এসেছে। এই দেখ, তোমার জন্যে কটা সন্দেশ রেখে যখন শুনল তুমি আমার খাবার দিতে আসবে, সেই অপেক্ষায় বসে আছে।" সুলেখা জ্যোতির কথায় সায় দিয়ে বল্ল—, "তা তুমি এত দেরী করলে কেন কাকা ? আমি বাড়ী যাব, অনেক বেলাও হ'ল।"

বিশু-মাঝি—, "আমরা নানান ভেজালের লোক মা; আমাদের কি আর কিছুর ঠিক আছে ? তা মা! ভগবান তোমার মঙ্গল

করুন। তুমি আবার মিষ্টি আনতে গেল কেন? তোমার সু-খবরই আমাদের বড় মিষ্টি।"

সুলেখা—, "তা হোক।" বলে বাকি কটা সন্দেশ সমেত বাক্সটা বিশুর হাতে দিল। বিশুও খুশি হয়ে হাত পেতে নিল। সুলেখা উত্তর দিল—, "কাকা, এবার তাহ'লে উঠি! আর এ বৎসর আমি আগের চাইতে বড় ব্যস্ত থাকব। তাই তোমাদের কাছে খুব কমই আসব। কিছু মনে করো না। আর তুমি ত আছ, দেখো। যখন যা পারি দেব।"

বিশু—, "না-না, মা! তুমি একটুও চিন্তা করো না। মন দিয়ে পড়া-শুনা কর। বড় হও।" সুলেখা বিশুর হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বল্ল— "এটা রাখ আজ আমি আসি। বড় বেলাও হ'ল।"

বিশু-মাঝি সঙ্কোচে হাতটা বাড়িয়ে নিয়ে বল্ল—"আমাদের জন্যে কেউ ভাবে না, মায়ের আমার কত জ্বালা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

সুলেখা 'আসি' বলে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

এদিকে সুলেখা নূতন বৎসরের পড়াশুনা মন দিয়েই আরম্ভ করেছে। সুলেখার চাল-চলন, গতি-বিধি অত্যন্ত শান্ত ও সংযত, বাহ্যিক অভিব্যক্তি বড়ই কম। বাইরে সকলে এবং বন্ধু-বান্ধবীরাও জানে জ্যোতির প্রতি সুলেখার দয়া ও সহানুভূতি অন্যান্য সকলের চাইতে বেশী, যদিও তা নজরে পড়ার মত তবুও এমন কিছু নয় যা সমালোচনার মত। তাই সুলেখা যখন জ্যোতির সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা বল ত বা কিছু দিত তা নিয়ে কেহ মাথা-ব্যথা করতো না। এদিকে বিশু-মাঝির স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে আসছে—, আজ এটা কাল সেটা লেগেই আছে কে তাদের ভাত-ডাল করে তা নিয়ে মাঝে সাঝে বেশ সমস্যা হয়ে উঠতে লাগল। বিশুর ছোট ছেলে রতন বৎসর চব্বিশ পঁচিশে পা দিয়েছে—, তাই উপায় না দেখে বিশু একটা গরীবের ঘরের মেয়ে দেখে ছোট

ছেলের বিয়ে দিলে যাতে সংসারটা বজায় থাকে ও যাতে সকল সময়ে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত-ডাল পায়। কিন্তু ছোট-ছেলের বিয়ের বৎসর খানেকের মধ্যেই বিশুর স্ত্রী মারা যায়। এখন আর বিশুর সংসার বলতে আগের মত আর টান নেই। তাই তার ঘরখানা ছোট ছেলে-বৌকে ছেড়ে দিয়ে রাতে খেয়ে জ্যোতির জন্যে খাবার নিয়ে জ্যোতির ঘরের বারান্দায় এসে শোয়।

ইতিমধ্যে সুলেখা মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ-মাধ্যমিকে ভর্ত্তি হয়ে পড়া-শুনা করছে। এই ভাবেই সুলেখা-জ্যোতি-বিশুর দিনগুলো গতানুগতিক ভাবেই চলছিল। কিন্তু চির দিন কারো সমান যায় না। বিশুরও তাই হ'ল। বিশুর ছোট ছেলের বৌ ক্রমে ক্রমে অন্য আর দু-জন বড়-জায়ের কাছে ভাঙ্গানি-ভাংচানি পেয়ে পেয়ে একদিন শ্বশুরকে মুখ-ফুটে বলেই বসল— "ঐ অন্ধ জ্যোতি আমাদের কে? যে আমাকে চিরকাল তার ভাত রাঁধতে হবে?" বিশু ছোট বৌমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল—, "মা তুমি অমন করছ কেন? আমাদের রান্না ত হয়-ই ; তার মধ্যে না হয় আর একমুঠো চাল নেওয়া হয়! এতে এমন কি আসে যায় বাপু।"

ছোট বৌমা—, "কেন? আমি কি এ বাড়িতে পথের যত অন্ধ-কানা-খোঁড়ার ভাত রাঁধতে এসেছি? অতবড় মদ্দটাকে আমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে?"

বিশু—, "ছি-ছি-ছি মা! এ কি কথা বলছ! সে তার খায়। সে ত চাল কেনার টাকা দেয় আমাকে।"

ছোট-বৌ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বল্ল—, "একটা কানার আবার কত আয় যে তোমায় টাকা দেবে চাল কেনার? তোমার ঘাট-পারানির টাকা হ'তে তুমি তার নাম করে চাল কিনে দাও, আর সব টাকা ওখানে রাখ। আমাদের ফাঁকি দেবে বলে।" বিশু মাথায় হাত দিয়ে বসে বল্ল—, "যাদের জন্যে চুরি করি তারাই বলে চোর! ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা! এ সংসারে আর কি দরকার?" অথচ মুখ ফুটে বিশু

প্রকাশ করল না যে, জ্যোতির চালের খরচ সুলেখা দেয়। মুহূর্তে ভেবে নিল তাতে একটা ভদ্র ঘরের মেয়ের নামে নানান কথা উঠবে। আর এই সব মেয়েছেলেরা যা তা কথা রটাবে। তাই খানিক চুপ করে থেকে বিশু আবার ছোট বৌমাকে জিজ্ঞাসা করল—, তবে "তুমি কি বলতে চাও মা!" ছোট-বৌ—, "আমার এক কথা, আমি ভূতের ব্যাগার খাটতে পারব নি। যত অন্ধ আতুর-খোঁড়ার ভাত আমি রাঁধতে পারব নি। তোমার দয়া-ধর্ম করতে ইচ্ছে হয়, তুমি তাদের রেঁধে খায়াও গে! আমি পারব নি।" বিশু হতাশার সুরে বল্ল—, "বেশ তাই হবে। বাড়ি ঘর সবই ত ছেড়েছি—, আজ হতে তোদের হাঁড়িও ছাড়লাম।" রতন দুপুরে ভাত খেতে এলে ঘটনা রতনের কানে গেল। রতন যে আগেও বৌ-এর কাছে মাঝে মাঝে এ-সব বলতে না শুনেছে তা নয়। তবে বৌকে বুঝিয়েছে—, "বাবা বাবার খায় আর জ্যোতি জ্যোতির খায়, এমনও বলেছে—, দেখ বাবা আর কটা দিন? আমার দু-বিঘে জমির সাথে আর ঘাটটাও বাড়তি লাভ হবে। বাবাকে একটু মানিয়ে চল্!" কিন্তু কে কার কথা শোনে! যাক রতন বাড়িতে খেতে এসে বৌ-এর কাণ্ড সব শুনে জ্যোতির বাড়িতে চলে এল বাবাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে ও খাওয়াতে। কিন্তু বিশু ছেলেকে বোঝাল—"সব আমার কপাল বাবা! সুখ চাইলেই কি সুখ পাওয়া যায়? সুখ কপালে থাকলে হবে? তুমি দুঃখ করো না, আমি রাগ করিনি। আমি আর বাড়িতে যাব না। ধর্ম বলতে একটা জিনিষ আছে, আমি কথা দিয়েছি, সে কথা ফেলে আমি তোমার কাছে ভাত খাতি পারব না বাপু! এক মুঠো ভাতের জন্মে যখন এত কথা, আমি ত এখনও হাল ধরতে পারি; এক মুঠো ফুটাতেও পারব। আজ হতে আমি এখানেই থাকব, এক বেলা দুটো ফুটাব আর দু-বেলা দু বাপ বেটাতে খাব। আর তোমায় ত সবই ছেড়ে দিয়েছি—ঘাটও এক বেলা আমার, আর এক বেলা তোমার; আর আমি গত হলি দু-বেলাই

তোমার।" এমন সময় জ্যোতি সব শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বার বার বিশু কাকার হাতধরে অনুরোধ করতে লাগল, "কাকা। একি ? আমার জন্যে তোমার এত কষ্ট কেন হবে ? তুমি ঘরে যাও। আমায় দেখতে এসো। না হয় রাতে শুয়ো—কিন্তু এখানে রেঁধে খেতে হবে না। লোকেই বা কি বলবে ?" বিশু—, লোকে ত অনেক কথাই বলে, তার মধ্যে কাজের কটা ? আর নেয্যই বা কটা ? লোকের কথা শুনে আমার বিবেক, আমার নেয্য বোধকে, ধর্মকে বিসর্জন দেব ? না, তা হবে না, আমি যা ভাল বুঝলাম তাই করলাম।" রতন জ্যোতি যখন বিশুর মত ফেরাতে পারল না তখন বাধ্য হয়ে রতন মাথা নিচু করে ফিরে গেল এবং সেই দিন হ'তে বিশু তার ছোট-বৌ এর কাছ হ'তে সরে এল এবং জ্যোতির ঘরেই আশ্রয় নিল। এখন হ'তে ঘাটে সকাল হ'তে দুপুর পর্য্যন্ত বিশু থাকে—, আর দুপুরের পর হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তার ছোট ছেলে রতন থাকে। দুপুরে এসে বিশু যা পারে রান্না করে, তাই জ্যোতি ও বিশু দু-বেলা খায়। এ সব ঘটনা সুলেখা না শুনেছে বা না জেনেছে তা নয়—, সুলেখা জেনে-শুনেও কিছু করতে পারেনি ; তার তখন কিছু করারও ছিল না। তাই তাকে সব কিছু মুখ বুজে থাকতে হয়েছে এবং মাসে মাসে যা পেরেছে, বিশু কাকার হাতে তুলে দিয়েছে।

এদিকে দেখতে দেখতে আরো দু-তিন বৎসর গড়িয়ে গিয়েছে। সুলেখা উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে আমতার গার্লস্ কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হয়ে দ্বিতীয় বৎসর চলছে। এমন সময় একদিন সুলেখার বড়-দিদি ও জামাইবাবু শ্বশুর বাড়ীতে আসতে ঘাট পার হবার সময় দেখতে পেল—ঘাটের আগের খেয়ায় সুলেখা জ্যোতিকে হাত ধরে নৌকায় তুলে আবার ওপারে হাত ধরে নামিয়ে ঘাটের উপর তুলে হাতে কি একটা দিয়ে সুলেখা বাড়ীর দিকে রওনা দিল, আর জ্যোতি তার হাতের লাঠি নিয়ে তার ঘরের দিকে হাঁটা দিল। সুলেখার বড় জামাইবাবু সুলেখাকে ডাকতে

যাচ্ছিল—কিন্তু সুলেখার বড়-দিদি তার স্বামীকে টিপে দিল, "না থাক, ডাকতে হবে না। কে কোথাকার কে, ঘাটের একটা অন্ধ-জোয়ান-মদ্দ, তাকে হাত ধরে আবার পার করে ও-পারে নিয়ে তুলে দিল। লোকে কি বলবে? বাড়ী গিয়ে বাবাকে সব বলব। তার আদরের ছোট মেয়ের কলেজী-বিদ্যের গুণ। এখন ডাকলে মান থাকে?" সুলেখা এপারে কোন দিকে না তাকিয়ে আপন মনে বাড়ী চলে এল। এদিকে সুলেখা আসার ঘণ্টাখানেক বাদে সুলেখার বড়দি ও বড় জামাইবাবু বাড়ী এল। অন্যান্য বারের মত সুলেখা তার বড়দি ও বড় জামাই-বাবুকে হাসি মুখেই আপ্যায়ন জানাল। জিজ্ঞাসা করল—, "তোরা কখন এলি? আমার সঙ্গে ত পথে দেখা হল না!" বড়দি গম্ভীর মুখে উত্তর দিল—, "কি করে আর দেখা হবে? তুমি এখন কি আর আমাদের দিকে নজর দেবার সময় পাও?" বড় জামাইবাবু বল্লেন—, "না, তুমি আগে ভাগে এসেছ ত, তাই আমাদের আর কি করে দেখবে?" সুলেখা বড় দিদির কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে হজম করে গেল; ভাবল—, "ওরা কি আমার সঙ্গে জ্যোতিকে দেখেছে?" আবার ভাবল—, "যদিই দেখে থাকে আমি জ্যোতির হাত ধরে পার করে দিয়েছি—, তা কি আর হবে? দ্যাখে—দেখেছে।" যথারীতি রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার আগে সুলেখার বড়দি মা-বাবার সামনে সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করল—, "ও কে রে? ঘাটে হাত ধরে নাবিয়ে ঘাটের উপরে নিয়ে গিয়ে হাতে কি একটা দিলি?" সুলেখা মুহূর্ত্তেই সব বুঝে নিল—কেন বড়দি বাড়ী ঢুকেই মুখখানা ভার করে বলেছিল—, "এখন কি আমাদের দিকে আর নজর দেবার সময় পাও!" তাই নিজেকে সংযত করে স্থির ও গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল—, "এতই যখন দেখেছ—, তবে এটা দেখতে পাওনি যাঁর হাত ধরে খেয়া হ'তে নামিয়ে দিলাম তাঁর চোখে আলো আছে কি নেই।"

সুলেখার বড়দি—, "আবার মেজাজ দেখ না! কথার কত ঝাঁঝ। কলেজী-বিদ্যের গুণ।"

সুলেখা—, "খবরদার লেখা-পড়ার ব্যঙ্গ করবি না। লেখা-পড়া শিখলে বোধ হয় এমন অভদ্রের মত কথা বলতিস না।"

বড়দি—, "দেখলে ত মা, কত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের ভদ্র-অভদ্র বলে খোঁটা দেয়, কালই সকালে চলে যাব। আমাদের মান-সম্মান নেই? কানা হলেও সে ত একটা মদ্দ-মিন্‌সে।"

সুলেখার বাবা বিস্ময়ে উত্তর দিলেন—"কি হচ্ছে কি? কে?"

সুলেখার মা বল্লেন—, "বেতাই ঘাটের জ্যোতি, দেখতে পায় না ত, তাই সুলেখা তার হাত ধরে খেয়া থেকে নামিয়ে দিয়েছে।"

সুলেখার বাবা ব্যাপারটা এতক্ষনে বুঝে উত্তর দিলেন—, "ওঃ তাই। তাতে আর কি হয়েছে? আর জ্যোতির বাবা তিনকড়ি সামন্ত আমার বাল্য বন্ধু ছিল। এক সঙ্গে আমরা ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছি। ও গাজিপুর হ'তে আসত, আর আমি খড়িওপ্‌ হতে আমতায় মাইনর স্কুলে পড়তে যেতাম। ওরা আমাদের পাল্টা ঘর, কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল একটা বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে— আজ তার কি অবস্থা! আহা আমারই ত বন্ধু-পুত্র, আমাকে ত দেখা উচিৎ। পর পর ওর বাবা-মা মারা গেল, আর ছেলেটাও পড়তে পড়তে অন্ধ হ'য়ে গেল। তবে শুনেছি ছেলেটা বেশ ভাল। তা আর কি হয়েছে, চোখে দেখে না, তাকে হাত ধরে নামাতেই ত হয়। তা মা তুমি এখন বড় হয়েছ ত তাই দিদি যা বলছে রাগ করো না।" সুলেখা বাবার কোন কথায় সায় না দিয়ে চুপ করে থাকল। কিন্তু সুলেখার বড়দি বাবার কথায় উত্তর দিয়ে বল্ল—, "বাবা এখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। আগে আমাদের বেলায় ছিল শুধু কর্ত্তব্য আর শাসন। আর এখন? এখন ছোট মেয়ের বেলায়—ভালবাসায় অন্ধ হয়েছ। মেয়ে যা বলে তাই। মেয়ে অনেক বড় হয়েছে—, এবার বিয়ে দাও। আমাদের অমন বয়সে কবে বিয়ে হয়ে গিয়েছে।" সুলেখা আর থাকতে পারল না, উত্তর দিল—, "এতই যখন ভাবনা তবে আমার জন্যে না ভেবে নিজের

মেয়ে ত বেশ বড় হয়েছে—, তার জন্যেই ভাব—কাজে দেবে। আমার জন্যে ভাববার লোক আছে।'' সুলেখার মা তাড়া দিয়ে বল্লেন—, "ছিঃ তোর বড় মুখ হয়েছে—, বড় দিদি দাদা থাকলে অমন বলেই থাকে।'' সুলেখা কোন কথার উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে শুতে গেল।

পর দিন সুলেখা যখন কলেজে যাচ্ছে—, সুলেখার বড়দি ও জামাইবাবু ঘর হ'তে তাকিয়ে আছে। দেখতে ভালই লাগছে। তবুও ভাল লাগার অভিব্যক্তি হিংসার রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। তাই মাকে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—, "ওর এবার কোন্ ইয়ার ?" মা—, "সেকেণ্ড ইয়ার শেষ করেছে—, এবারই থার্ড ইয়ারে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে।" মায়ের কথা শুনে বড় মেয়ের মুখখানা আরো গম্ভীর হ'ল। চিত্রলেখা কিছুক্ষণ দম ধরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল—, "কি নিয়ে পড়ছে ?" মা—, "তা আমি অত বুঝি না বাপু ! তবে মনে হয় কি যেন অনার্স নিয়ে পড়ছে।'' চিত্রলেখা—, "কিসে অনার্স ?'' মা—"ওঃ, হ্যাঁ, বাংলায়, বাংলায়।" চিত্রলেখা ঠোঁটটা একটু কুঁচকে বল্ল—, "তা যাই না ও না কেন শেষে হবে ত ডেগ্-মাষ্টার।" মা জিজ্ঞাসা করলেন করলেন—, "ডেগ্-মাষ্টার আবার কি পড়া ?" চিত্রলেখা এবার হেসে ফেলে বল্ল—, "তাও বোঝ না ? ডেগ্-মাষ্টার মানে বিয়ের পর ত হাঁড়ি-ডেগ্-কড়াই নিয়ে রান্নাঘরের চার্জ নিতে হবে ! হাঁড়ি ডেগ্ মাজতে হবে না ?" মা শুনে উত্তর দিলেন—, "হাঁড়ি-কড়াই-ডেগ্ কার না জীবনে দরকার হয় ? জীবনে বেঁচে থাকতে হ'লে খেতেও হ'বে, আর রাঁধতেও হবে।'' বড় মেয়ে চিত্রলেখা ভ্রূটা কুঁচকে মাকে উত্তর দিল—, ''তুমি আবার উল্টো বুঝলে। ছোট মেয়ের বিয়ে দেবে না ?'' মা—, "তা কেন দেব না ? নিশ্চয়ই দেব। এবার বি. এ. পাশ করার পর বিয়ের চেষ্টা করা হবে।'' চিত্রলেখা—, "এত বয়সে এখনও চেষ্টা ? আমি বলছিলাম কি আমার এক দেওয়র এবার ব্যবসায় বেশ উন্নতি করেছে। এবার নতুন তেল কল খুলেছে,

তা ওর সঙ্গে বিয়ে দাও না !" মা—, "তা তোর বাবার সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলিস্. আর সুলেখার মতওত নিতে হবে।" চিত্রলেখা—, "মত আবার কি নিতে হবে ? আমাদের কি মত নিয়েছিলে ?" মা—, তাই বলে তোমাদের অমতেও দেওয়া হয়নি। আর ও লেখা-পড়া শিখছে, ওর একটা নিজস্ব মত নেই ? আমি ওকে জিজ্ঞাসা করবোখন।" চিত্রলেখা—, "না, থাক আমিই বাবাকে জিজ্ঞাসা করবোখোন।" দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর চিত্রলেখা তার বাবাকে বিশ্রামের সময় জিজ্ঞাসা করল—, "বাবা, সুলেখার বিয়ে দেবেনা ?" মণিমোহন—, "দেব না, না কেন, দেব বইকি ? তবে পড়ছে পড়াশুনা সারুক।" চিত্রলেখা—, "মেয়ে বি. এ. পাশ করলে ছেলেও এম. এ. পাশের দরকার হবে, তখন কত লাগবে ?" মণিমোহন—, "আমার ত সব কর্ত্তব্য শেষ, এখন যা আছে—সব সুলেখার , একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেব যার কেউ নেই, যাতে আমার ঘরেই থাকে।" চিত্রলেখা—, "ঘরজামাই রাখবে ? কোন ভাল ছেলে তা থাকে ?" মণিমোহন—, "দেখি চেষ্টা করতে ত দোষ নেই।" চিত্রলেখা—, "আমি বলছিলাম কি, আমার ছোট-দেওয়র এবার একটা সর্ষে ভাঙান ঘানি কল খুলেছে—, তার সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয় !" মণিমোহন—, "মন্দ হয় না, তবে একই বাড়িতে দুই বোন দিতে নেই, তাতে বোনে বোনে শান্তি বজায় থাকে না এবং ভায়ে ভায়ে ত মিল থাকেই না ; উপরন্তু বাপের বাড়ী ধরে টান পড়ে। কাজেই ওটা না হওয়াই ভাল।" চিত্রলেখা—, "আমি তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছিলাম, কোথায় খোঁজা-খুঁজি করবে। তা তোমরা যা ভাল বোঝ করবে, তাতে আমার আর বলার কি আছে। তার উপর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তার আর কোন কথার দাম থাকে ?" মণিমোহন—, "এটা আবার তোমার রাগের কথা মা ! যা হয় আমি বল্লাম, সুলেখা আসুক, তোমার মা যেন কথাটা পাড়ে।" সুলেখা কলেজ হ'তে ফিরে এলে রাত্রে খাওয়ার পর সুলেখার মা তাকে ডেকে বল্লেন—, "তোর দিদি আর জামাই বাবু

এসেচে একটা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। পাত্র তোর বড় জামাই বাবুর ছোট ভাই, এবার নাকি একটা বড় তেলের কল খুলেছে, আর ওদের অবস্থাও ভাল। তুই ত তাকে দেখেছিস্! তা তোর কি মত?" সুলেখা গতকাল হ'তে তার দিদির কথাবার্তায় এবং আচরণে বিরক্ত হয়েই ছিল—, তার উপর এই তেল-কলওয়ালা তার ছোট দেওয়রের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—, "তাই বড় দি জামাইবাবু ঘাট হ'তে হন্যে হয়ে তার ভায়ের ঘানি টানার জন্যে গরু খুঁজতে বেরিয়েছে? তা আমাদের বাড়ী কেন? যাদের অত পয়সা আছে—তাঁরা হাটে বাজারে খুঁজলে অনেক কলুর বলদ পাবে।" বড় জামাইবাবুর মুখে কোন কথা নেই, বড় বোন গজরাতে লাগল—"অপমান হ'তে এখানে আসা? কাল সকালেই চলে যাব" ইত্যাদি। সুলেখার মা সুলেখাকে বকতে লাগলেন—, "কথার কি ছিরি! ভাল করে কথা বলতে জানে না। লোকের মান সম্মান রাখতে জানে না। মেয়ে থাকালেই অমন কত কথা হয়।" ইত্যাদি। সুলেখা মাকে উত্তর দিল—, "বড়রা যদি আগে ভাল করে কথা না বলে, তবে ছোটরা যদি তার উত্তরে কিছু অন্যায় বলেই থাকে তাতে কি বড়দের চাইতে দোষ বেশী করেছে?" বড়দি চিত্রলেখা থাকতে না পেরে উত্তর দিল—, "কি এমন তোমার অসম্মান করে কথা বলা হয়েছে? তুমি লেখাপড়া শিখছ বলে তোমারই শুধু মান আছে?—আর আমাদের নেই? আমরা কি এখানে পাত পাততে এসেছি?" সুলেখা—, "কেউ কারো বাড়ী পাত পাততে যায় না, যায় নিজের প্রয়োজনে, তবে—মান? মান দিয়ে তবে মান রাখতে হয়। গতকাল যদি পার ঘাটে আমায় দেখলি তবে কেন আমাকে ডাকলি না। কেন আড়াল হ'তে দেখে দেরী করে বাড়ী এসে মা-বাবার সঙ্গে চুপিচুপি লাগালি। চোখে দেখে না এমন একজনকে যদি হাত ধরে নামিয়ে বা কিছু দিয়েই থাকি তাতে কি এমন অ-মানুষের কাজ করেছি। সে মন্দ কি মিন্সে সেটা ত সদর সই দেখতে পেয়েছিলে! তা আবার বাড়ী

এসে ব্যাখ্যা না করলে সুখ হচ্ছিল না।", চিত্রলেখা—, "তাই বলে আমাদের 'কলু' বলবি?" সুলেখা—, "কলু বরঞ্চ ভাল, তারা সর্ষে হ'তে তেল পিষে বের করে সমাজে দশজনের উপকার করে। আর তোরা, —তোদের মত মানুষ পেষাই করা মহাজনেরা। মানুষের দুর্যোগ ও অসময়ের বা বিপদের সুযোগ নিয়ে—তাকে নিংড়ে তাদের সম্পদ্ হরণ করে নিজেদের পেট মোটা করিস্।" সুলেখার বাবা তখন সুলেখাকে তাড়া দিলেন—, "একি হচ্ছে! তোমার দিদি জামাইবাবু যদি কিছু বলেই থাকেন তাই বলে তাঁদের সঙ্গে এমন করে কথা বলে! লেখাপড়া শিখে এ কি কথা! শুতে যাও। মনে রেখো তারাও তোমার অভিভাবক।" চিত্রলেখা—, "তোমরাও এখন আমাদের কুটুম ভাব?" মণিমোহন—, "জামাই ত চিরকালের কুটুম। তার মান ত আগে রাখতে হয়।" চিত্রলেখা—, "তাই আমাদের মান রাখলে।" মণিমোহন—, "তা আমি কি করব মা! আমি কি করলাম! তোমরা বোনে বোনে কথা কাটাকাটি করবে আর দোষ হ'ল আমার। সত্যিই ত গতকাল যখন সুলেখাকে পার ঘাটে দেখলে—, তখন ডেকে তাকে কথা বল্লেই ত মিটে যেত। আর একজন চোখে দেখে না অন্ধ মানুষ তাকে হাত ধরে তুলে ধরা ত পুণ্যের কাজ। তাতে সে আমার বাল্য-বন্ধুর ছেলে। এটা ত মহৎ কাজ মা! অমন করে না বল্লে ত ওর মন বিগড়াত না! সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেই হ'ত—ওকে? ওকে কি দিলি—পয়সা? ব্যাস্ মিটে যেত।" চিত্রলেখা—, "তোমরা সবাই সমান—, আমাদেরই অন্যায় হয়েছে। তুমিও আজ-কাল সুলেখার উপর স্নেহে অন্ধ হয়েছ।" মণিমোহন—, "হ্যাঁরে! তাই হয়। ভালবাসার ধর্মই অন্ধ হওয়া। তা না হ'লে তোদের শত দোষ ক্ষমা করে আবার বুকে টেনে নেই! যাক্ মা রাগ করিস্ না—শোগে যা। হাজার হ'লেও ও তোদের ছোট। সুলেখা এর মধ্যে আগেই তার ঘরে শুতে চলে গেয়েছে। সুলেখার মা তার স্বামীকে বল্লেন—, "তুমিও ঘরে যাও।" আর

চিত্রলেখাকে বল্লেন—, "নিজেদের মধ্যে বোনে-বোনে কথা কাটা-কাটি করে বাবা-মাকে জড়ালে লোকে কি বলবে? ঘরে জামাই, ঘরে যা মা—! তুই বড়, ছোটোর সঙ্গে রাগ করতে নেই; যা রাত হয়েছে—ঘরে যা—।" বলে উনিও নিজের ঘরে গেলেন।

সকালে উঠে মণিমোহন সরকারের বড় মেয়ে চিত্রলেখা চলে যাবার জন্যে তৈরী হ'চ্ছে তখন মণিমোহন বড় মেয়ের সামনে এসে বল্লেন—, "মা! তুই নামেই বড়, এখনো ছেলে-মানুষ, এমন করে সকালে না খেয়ে বেরুলে তোমার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা কি বলবে? তাতে আমার না হয় মান গেল—; তুমি ত এই বাড়ীর মেয়ে! তোমার মান থাকবে?" সুলেখা ব্যাপার-স্যাপার দেখে পড়ার টেবিল হ'তে উঠে এসে তার বড়-জামাই বাবুর হাত ধরে বল্ল—, "আমার না হয় অন্যায় হয়েছে, আমি সকলের ছোট ত বটে, আর আপনাকে ত কোন অসম্মান করিনি! বোনে-বোনে কথা কাটা-কাটি এমন হয়েই থাকে। আজ যাবেন না। গেলে মা-বাবা দু-জনেই মনে দুঃখ পাবে। যদি বিশেষ কাজ থাকে তবে তবে অন্তত দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে যাবেন।" সুলেখার কথায় তার বড় জামাইবাবু বল্লেন—, "না না, এখন বাসি মুখে আমি ত যাচ্ছি না।" সুলেখা তাড়াতাড়ি উঠে চা করে বড় জামাইবাবু ও বাবাকে ডেকে চা-বিস্কুট দিল। মা ও বড়দিকেও চা-বিস্কুট দিতে সকালের থম্‌থমে ভাবটা কাটলেও চিত্রলেখার মুখটা ভারই থাকল। সুলেখার বড় জামাইবাবু বল্লেন—, "ভাগ্যিস তোমার দিদির সঙ্গে কাল তোমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তাই তোমার হাতে আজ চা খেতে পেলাম।" সুলেখা—, "এটাও কি কম ভাগ্যের কথা! তাই নিজের লোকের সঙ্গে মাঝে মধ্যে একটু বিবাদও ভাল—, ভাবটা আরো জমাট হয়।" হেসে ফেলে বড় জামাইবাবু উত্তর দিল—, "তুমি সত্যিই এবার বড় হয়েছ।" সুলেখা—, "তা ছোট বলে কি চিরকালই ছোট থাকব?" বলে স্নান করতে গেল, তার কলেজ আছে। সুলেখা স্নান আহার সেরে যখন

কলেজে বেরুচ্ছে তখন বড়-জামাইবাবু ও বড়দিকে উদ্দেশ্য করে বল্ল—, "তোরা আজ থাকিস্! ওবেলা এসে আজ সেজদির বাড়ী যাব।" বড়-জামাইবাবু উত্তর দিল—, "দেখব।" বড়দি কোন উত্তর দিল না। সুলেখা কলেজে বেরিয়ে গেল। কিন্তু চিত্রলেখার মনের গরম আর গেল না। সে মধ্যাহ্নের আহারাদি সেরে একটু পরেই স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মায়ের আপত্তি শুনে বলল, "বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে রেখে এসেছি, তাদের পড়া-শুনা আছে ত।"

শত্রু পরে হয় না—শত্রু ঘরেই হয়। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবীদের চাইতে সুলেখার বোনেরাই বড় শত্রু হ'ল। প্রথমতঃ বাবার মুখে শুনেছে—, "যা আছে সুলেখার, এবং একটা ভাল ছেলে দেখে ঘর-জামাই করবে। তাতে সরকার বাড়ীর পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে সুলেখাই প্রথম অনার্স নিয়ে বি এ. পাশ করতে চলেছে। তাতে সুলেখা বড়দিদির ছোট দেওয়রকে বিয়ে করার প্রস্তাবকে অত্যন্ত অসম্মানের সঙ্গে অগ্রাহ্য করেছে, এবং তেল কলের কথা বলায়—'কলু' বলে উপহাস করেছে। যদি বাবা সত্যি সত্যি একটা গরীবের ভালছেলে দেখে ঘর-জামাই করে—আর পাঁচ বোনের বাপের বাড়ীতে আধিপত্য খর্ব হবে। এই জল্পনা-কল্পনা করে আর আর বোনে বোনে সকলে সুলেখার উপর বিরূপ হ'ল। তারা সকলে বিশেষ করে তার বড়-দিদির ছোট-দেওয়র উঠে পড়ে লেগেছে সুলেখার গতিবিধির উপর। কারণ সুলেখার বড়দির ছোট দেওয়র একদিন আমতা কলেজ-ফ্যাংশানে সুলেখাকে একটা লাল চওড়া পাড় কাপড় পরে এবং একটা লাল ম্যাচিং করা লাল ব্লাউজ পরে দুটো বেনি ঝুলিয়ে গান গাইতে দেখে—খুব মুগ্ধ হয়েছিল, এবং অনুসন্ধানে পরে জানল—এই সুলেখা তার বড় বৌদির ছোট-বোন। তাই তার মনে বড় আশা ছিল—সে সুলেখাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে নিশ্চয়ই বিমুখ হবে না। বিশেষতঃ তাদের প্রতিপত্তি আছে এবং সে নিজের নামেও একটা সরষে-পিষণের কল বানিয়েছে। তাতে বাড়ির

আর্থিক অবস্থা ভাল। নিজেকে দেখতে মন্দ নয়—, শ্যামবর্ণ বেঁটে-সেটে, পেট-মোটা হৃষ্ট-পুষ্ট!

"অর্থ—যার হাতে—পৃথিবীর সবকিছুই তার হাতে"—এমন একটা আত্ম-প্রত্যয়ের অহংকার নিয়ে—একদিন বড়-বৌদিকে বলেই ফেল্ল—লজ্জার মাথা খেয়ে—, বড় বৌদি—আবার তার স্বামীকে বলে, এবং দুজন মিলে খড়িগুপ্ শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছিল—প্রস্তাবটা দিতে। কিন্তু হিতে বিপরীত। অপমানিত হয়ে চিত্রলেখা তার স্বামীর সঙ্গে ফিরে এসে তার ছোট দেওয়র ও আর আর বাড়ীর সকলকে বল্লে—, "এখানে একই বাড়ীতে দুই-বোনের বিয়ে তার বাবা দেবেন না। এবং ছোট বোনেরও ইচ্ছা নেই—কোন ব্যবসায়ী পরিবারে বিয়ে করে।" আর ছোট দেওয়রকে ডেকে বল্ল—, "তোমার ঐ কলুর ব্যবসা আমার বোনের পছন্দ নয়।" তবে ছোট-দেওয়রকে আরো সান্ত্বনা দিল—"তোমার মোটামুটি লেখা পড়াজানা ভাল এবং আমার বোনের চাইতে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব। আমার বোনের আশা ছাড়। আর সত্যিই একই বাড়ীতে দু-বোনের বিয়ে হ'লে তা শেষে সুখের হয় না।" কিন্তু চিত্রলেখার ছোট-দেওয়র—তরুণের বড় আত্ম-মর্য্যাদায় লেগেছে, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—তাদের 'বিশ্বাস-বাড়ীর' প্রতিপত্তি এবং সে নিজেও স্বাবলম্বী হয়েছে—, একটা তেল-কলের মালিক—; আর কিনা তাকে 'কলুর' সঙ্গে তুলনা করল! তাই ভাবতে লাগল—, "এত রূপের-অহঙ্কার! এত বিদ্যার অহঙ্কার! দেখব তুমি কত বড় গাছে লগা বাঁধ। কত বড় বিদ্যেধর ধর।" তাই সে সন্ধানে সন্ধানে থাকে এবং নজর রাখে সুলেখা কার কার সঙ্গে মেলা মেশা করে।

এদিকে সুলেখার সেজদি মনলেখার বিয়ে হয়েছে 'থলিয়ায়'। তার মনে পড়ে—সেজদির বিয়ে বাবা হাতে করে দিয়েছিলেন বটে, তবে সেজদি ও সেজ-জামাইবাবুর সঙ্গে তাদের বাড়ীর কোন সম্পর্ক নেই। সে বড় হয়ে সেজ-জামাইবাবুর বাড়ীতে যায় এবং তারাও তাকে ভালবাসে।

সুলেখার সেজ-জামাইবাবু থলিয়াতে শিক্ষকতা করেন। মা সেজ-জামাইবাবু অমৃতলালকে ভালবাসলেও সুলেখার বাবার এই বিয়েতে অমত ছিল। তবুও বাধ্য হয়ে সম্প্রদান করে সেই রাতেই বলেছিলেন মেয়েকে— "কোন দিন যেন আমাকে তোমাদের মুখ দেখতে না হয়।" কারণ অমৃতলাল দে থলিয়া গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় দের একমাত্র ছেলে, অবস্থা মোটামুটি, কিছু চাষবাস আছে। ছেলে সবে বি. এ. পাশ করে স্কুল-মাষ্টারী ঢুকেছে। মণিমোহন সরকার সব দিক চিন্তা করে অল্প বয়স্ক পাশের গ্রামের তরুণ-গৃহশিক্ষক ঠিক করলেন, যাতে মেয়েদের পড়াশুনা ভাল হয়। স্ত্রী সেই কালেই স্বামী মণিমোহন সরকারকে বারণ করেছিলেন—, "মেয়েদের পড়াতে একটা বয়স্ক বুড়ো-শুড়ো মাষ্টার দেখলেই ত পারতে? এই উঠতি বয়সের মাষ্টার রাখলে ভাল হবে ত? আমাদের সবই ত মেয়ের পাল, তাতে মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে কাপড় পরতে ধরেছে—, এমন কাঁচা বয়সের মাষ্টার দিয়ে এই উঠতি বয়সের মেয়েদের পড়তে দেওয়া কি ঠিক্ হবে? তারপর কিছু হ'লে?" স্বামী স্ত্রীকে উত্তর দিলেন—, "আরে! তুমি বোঝ না। একটা হেঁপো-ধুপো বুড়ো মাষ্টার রাখব, বা একটা আধ-বুড়োই রাখলাম; তার লক্ষ্য থাকবে—শুধু মাস গেলে পয়সার পানে। তারপর আজ এ-ছুটী, কাল ও ছুটী, কাল বাতের ব্যথা, কাল কাজ ছিল—এসব ত লেগেই থাকবে। তাতে যদি বৃষ্টি-বাদলা হয় ত তিন দিন এলই না। জোয়ান-মাষ্টার রাখলে তারা অত কামাই ত করবেই না, তাদের নতুন এনার্জি। বুড়োর চাইতে অনেক পরিশ্রম করতে পারবে। আরে তুমি বোঝ-সোঝো না, এটা কাজ আদায়ের সাইকোলজি। একটা অল্প-বয়স্ক ছোকরা মাষ্টার একটা অল্প-বয়স্ক মেয়েকে দরদ দিয়ে পড়াবে। একটা বুড়ো কি তাই পড়াবে?" স্ত্রী—; "তার পর? যদি কিছু হয়?" মণিমোহন—"কি আর হবে? মেয়ে ত আমার! এমন কিছু যদিই হয়—তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।" তাই হ'ল। থলিয়ার তরুণ দে মণিমোহন সরকারের মেজ, সেজ, ন, মেয়েদের পড়াতে আরম্ভ করল। মণিমোহন সরকারের ধারণাই

ঠিক হ'ল। তরুণ ভালই পড়ায়। কামাই বড়-একটা করে না। নিতান্ত রবিবার বা এটা-সেটা পূজা-পার্বণ ছাড়া, এবং পড়াতে বসে সময়ের কাঁটা এগিয়ে চল্লেও তরুণের হুঁষ থাকত না। পড়া করিয়ে তবে ছাড়ত। মণিমোহন মনে মনে খুশি হ'তেন। এবং স্ত্রীকে ডেকে বলতেন—, "দেখছ! আমার ধারণা। তরুণ কত পরিশ্রম করে এবং মন দিয়ে পড়ায়।" স্ত্রী কোন কথা বলতেন না, তবে তরুণকে যত্ন করতেন। এক গ্লাস গরম-দুধ ও জলখাবার, যখন যেমন থাকত, না খাইয়ে ছাড়তেন না। দেখতে দেখতে দু-বছর হয়ে গেতে মনলেখা আর তরুণের ঘনিষ্ঠতা জমাট হয়ে উঠল, তা একদিন মনলেখার বই-এর মাঝে চিঠির মাধ্যমে ধরা পড়ল। মা মেয়েকে বক্‌লেন— বোঝালেন। কিন্তু মনে মনে বুঝলেন দোষ ত মেয়ের নয়—, তরুণেরও নয়; দোষ তার স্বামীর। তাই তিনি স্বামীকে সব বললেন—, "তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখ।" বলে চিঠির কথা শুনালেন। মণিমোহন রেগে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে বল্লেন—, "কালই তরুণকে জবাব দেব। বেইমান কোথাকার। যার শীল—, তারই নোড়া, তারই ভাঙ্গে দাঁতের গোড়া! মাসে মাসে আমার টাকা খাচ্ছে— আর আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম?" স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উত্তর দিলেন—, "বেইমান তরুণ নয়, বেইমান তুমি। সেদিন আমি সাবধান করিনি?—সে দিন তুমি কত সাইকোলজি দেখিয়েছিলে— মনে পড়ে! আজ তোমার সাইকোলজি ধরা পড়েছে। আর আজ? তিন মেয়ে এক সঙ্গে পড়িয়ে তরুণকে কটা পয়সা দাও?—মাসে তিরিশটা টাকা? আর খাটাও তার তিন গুণ—। আজ সুদে আসলে তরুণের সব ঋণ তোমায় শোধ করতে হবে। ঐ তরুণের সঙ্গেই মনলেখার বিয়ে তোমায় দিতে হবে। বাপের একমাত্র ছেলে ও শিক্ষিত ছেলে। অবস্থা তোমার মত না হ'লেও ত ভিক্ষে করে খায় না। তুমি বেইমানি করলেও আমি বেইমানি করতে দেব না। তাতে তোমার মেয়ের কলঙ্ক ছড়াবে—আর তোমারও মান বাড়বে না?" স্ত্রীর কথায়

সেদিন মণিমহোন কোন উত্তর দিতে পারেন নি। বরঞ্চ ওঝার মন্ত্রের মত তার ঔদ্ধত্যের ফণা আস্তে আস্তে নত হয়েছিল। বরং মনে মনে বুঝেছিলেন কি ভুল তিনি করেছেন। তাই পরবর্তী কালে তিনি কোন মেয়েদের আর বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়ান নি। এবং সকলের বিয়েও দিয়েছিলেন উঠতি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় ব্যবসায়ী ঘর দেখে। কেবল পারেন নি ছোট মেয়ের বেলায়। কারণ সুলেখা যত ভাল, তত শান্ত ও জেদী প্রকৃতির। আর উনিও ছোট মেয়ের কাছে স্নেহে বাঁধা পড়েছিলেন। যাহোক, স্ত্রীর কথায় উনি থলিয়ায় নিজে তরুণের বাবার কাছে গিয়ে সেজ মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করায় তরুণে বাবা মৃত্যুঞ্জয় দে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। কারণ মৃত্যুঞ্জয় দে মণিমোহন সরকারের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা জানতেন। দিন স্থির হ'ল। এবং যথা দিনে বিবাহও সুসম্পন্ন হ'ল, এবং সম্প্রদানও স্বয়ং মণিমোহনবাবুই করলেন। দানসামগ্রী বাদে আর সবই যথাযথ দিলেন। মাঝে হ'তে একটা চটুল ফক্কর তরুণের বন্ধু বরযাত্রী সম্প্রদানকালে পিছন হ'তে বলে উঠল—, "তাহলে উনি মেয়ে খাটিয়ে ছেলে ধরলেন।" মণিমোহন বাবুর আত্ম-মর্যাদায় ভীষণ লাগল। তাঁর কান দুটো লাল হ'য়ে উঠল। তিনি মর্যাদাসম্পন্ন ও ধনী। তাও স্ত্রীর কথায় প্রায়শ্চিত্তও করলেন। তাই আর সহ্য করতে না পেরে সম্প্রদান শেষেই বলে ফেল্লেন—, "আর যেন আমায় তোমাদের মুখ দেখতে না হয়।" তারপর ঘটনা যাই ঘটুক অনুতাপ ও আপশোষ—, কিন্তু বর অর্থাৎ তরুণ তা মনে রেখেচে। মনলেখা বৎসরে একদিন বিজয়ার প্রণাম করতে এলেও তরুণ বিয়ের রাতের পর কোন দিনও তার শ্বশুরবাড়ী আর আসেনি।

সুলেখা এই সেজ জামাইবাবুর খুব প্রিয়। সুলেখাও তার সেজ জামাইবাবুর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা বোধের জন্য তাকে ভাল লাগে এবং মাঝেমধ্যে থলিয়ায় সেজদির বাড়ীতেও বেড়াতে যায়। এই সেজদির

বাড়ী গিয়ে জামাইবাবুর কাছে শুনে এসেছে—, তার বড়দির ছোট দেওরের জল্পনা কল্পনা, এবং সেজ জামাইবাবুও সুলেখাকে সাবধান করেছিলেন—, "সাবধানে চলিস সুলেখা। তোর বড়দির ছোট দেওর অরুণ একটা বকাটে ও গুণ্ডা প্রকৃতির। তাতে তার হাতে পয়সা আছে, তোকে লোক ঠেকিয়ে হোক্, আর নিজে হোক অপমান করার তালে আছে।" সুলেখা সব শুনে সাবধানেই চলাফেরা করে, বরং মনে মনে তৈরী থাকে পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করার। দেখতে দেখতে সুলেখার তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে এবং বাংলায় অনার্স পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ: পাশ করেছে। মা বাবা সকলেই খুশি এবং বাবা মনে মনে সু-পাত্রের অনুসন্ধানের চেষ্টায় আছেন।

সুলেখা ইতিমধ্যে আমতা বালিকা বিদ্যালয়ের একটা শূন্য বাংলা শিক্ষিকার পদ কাগজের মাধ্যমে প্রচার দেখে নিজেকে ঐ পদের প্রার্থী করে যোগ্যতাবলী ও প্রাপ্ত পরীক্ষার নম্বরসহ একটি আবেদন পত্র দাখিল করল। এবং সুলেখা বিশেষ সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ লিপিও পেয়ে যথারীতি পদের অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে নিজের যোগ্যতাও পরীক্ষা দিল। পদের যোগ্যতায় সুলেখাই স্কুল পরিচালক সমিতির নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হ'ল। কারণ স্থানীয়, এবং মাধ্যমিক হ'তে বি এ অনার্স পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর প্রাপ্ত নম্বরের যোগ্যতা আর কারো ছিল না। এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছিল। তাই সুলেখা যখন তার স্কুলের কাজে যোগ দেবার মনোনয়ন পত্র পেল তখনই কেবল তার মাও বাবাকে সব জানালো। বাবা শুধু একটা কথাই বল্লেন—, "আমার যা আছে তাই কে খাবে? তুমি আবার কার জন্যে চাকরি করতে গেলে? কি দরকার ছিল চাকরির? তবে কোন বাধাও দিলে না। মনে মনে বুঝলেন—, যোগ্যতা যখন আছে করুক।" তার সঙ্গে এও স্মরণ করিয়ে দিলেন—, "বিয়ে-বা, সংসার ধর্মও ত করতে হবে!" সুলেখা—

কোন কথার উত্তর না দিয়ে একটা শুভ-দিন দেখে মা-বাবাকে প্রণাম করে আমতা বালিকা-বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষিকার পদে যোগদান করল। কিছু দিনের মধ্যেই প্রায় সকল ছাত্রীদের ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের—বিশেষ করে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রিয় পাত্রী হল! কারণ সুলেখা এই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল, এবং বড়-দিদিমণি তাকে আগা-গোড়াই চেনেন।

ইতিমধ্যে সুলেখার সঙ্গে জ্যোতির যে কোন সম্বন্ধ নেই তা নয়, তবে খুব সন্তর্পণে ও সাবধানে চলে। খুব-একটা জ্যোতির বাড়ী আর যায় না। গেলেও বেশীক্ষণ থাকে না। যা বলার ও যা দরকার তা দিয়েই চলে আসে। বিশু মাঝিকে মাঝে মাঝে হাতে কিছু টাকাও দেয় আবার খোঁজ খবরও নেয়। মাঝে মাঝে জামা-কাপড় ও এটা-ওটা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিশুর হাতে দিয়ে আসে। বিশু-মাঝি ও জ্যোতি বুঝেই নিয়েছে—, বড় ঘরের মেয়ে—, তাতে লেখা-পড়া জানা মেয়ে, আবার স্কুলের মাষ্টারী পেয়েছে; তার জ্যোতির কথা মনে রাখতে বয়ে গিয়েছে। স্কুলে পড়ার সময় উঠতি বয়সে—বাস্তব বুদ্ধি ছিল না, আবেগ ছিল, তাই আবেগে কত কথা বলেছে। তাই বলে তার আত্মমর্যাদা ও মূল্য কি আজ পথে বিকাবে?" তবুও বিশু সুলেখার গুণে ও দয়ায় মুগ্ধ। তাই দেখলেই 'মা' ছাড়া ডাকে না। আর জ্যোতি?— জ্যোতি—সেই পেন আর ডায়েরী খাতা দেবার দিনের কথা মনে করে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে সকলের অলক্ষে চোখের জল ফেলে। ভাবে—, সেই ত আমার চরম পাওয়া। লেখা হাত আমার বুকে রেখে শপথ করেছিল—, আমি তোমার, তোমার, তোমার।"

আবার আমার অন্ধ-জীবনে কি চাই? আমার অন্ধকার জীবনে আর একটি আলোর জীবনকে বাঁধতে চাওয়া—মানে স্বার্থপরতা, এবং অন্যায়; শুধু তাই নয়—নিতান্ত হীন-স্বার্থপরতা। এই সব ভেবে সে কত গান আর কবিতা লেখে লেখাকে নিয়ে। তবুও

ঈশ্বরকে জানায়—, "ঈশ্বর লেখাকে অনেক বড় কর, অনেক মহৎ কর, আমি আমার এই অন্ধকারে তাকে ধরে রাখতে চাই না। তাকে অনেক বড় কর ভগবান।"

কিন্তু সুলেখা বড় সাবধানে থাকে তার দিদিদের ও বড়দির ছোট-দেওয়রের ষড়যন্ত্রের কথা মনে রেখে। জ্যোতির প্রতি উদাসীন ও অবহেলা নয়—, শুধু প্রকাশ্যে নৈতিক অধিকারে—যাবার অপেক্ষায় আছে মাত্র। তাই আজকাল আর কোন প্রয়োজনের তাগিদেও সুলেখা আর বিশেষ যায় না। তবে সব খবরই রাখে ও যা প্রয়োজন সাহায্যও করে যায়। গভীর-প্রেমের স্বভাবই অহেতুক সন্দেহ করা। জ্যোতিও সেই দোষ হ'তে মুক্ত নয়। তাই তার মনে কত কথা জাগে। যেদিন সুলেখা তার চাকরি জীবনে প্রথম মাহিনা পেল, সেই টাকায় প্রথম মা-বাবার, বিশু-মাঝির ও জ্যোতির জন্য একটা করে কাপড় কিনল। এবং পরের দিন একটু মিষ্টি নিয়ে যখন জ্যোতির ও বিশুর কাপড় নিয়ে জ্যোতির বাড়ী গেল, দেখল জ্যোতির চোখে জল, তার খাতায় কি যেন আপন মনে লিখে চলছে। আস্তে আস্তে পিছনে গিয়ে দেখতে চাইল কি লিখছে? দেখল জ্যোতি—আপন মনে লিখে যাচ্ছে।

মনে কি পড়ে না ওগো কবি-রাণী, বিরহিণী প্রিয়া মোর ?
শ্রাবণ-ধারা-সাথে, বরিষণ-অশ্রু-পাতে হয় নাকি আঁখি-ভোর !
বাজে নাকি হৃদয়-বীণা, মেঘেরও-মেদুরে, কেকার নূপুরে—
আমারি সুরে গাওয়া—, তোমারই চির-চাওয়া মিলনেরই সুরে !
ওগো রাণী মোর। যতই বেসেছ ভাল, ততই করেছ ঋণী—,
ততই ঋণী তব কাছে আজও পূজারিণী।

সুলেখা জ্যোতির লেখা শেষ না হ'তেই হেসে ফেল্ল—, "বেশ! তাহলে সুদে আসলে অনেক জমে গিয়েছে—, এবার শোধ কর।" জ্যোতি অনেক দিন বাদে সুলেখার গলা-শুনে চমকে উঠে বল্ল—, "লেখা! কতদিন বাদে এলে! ভাল আছ'ত?" সুলেখা—, "হ্যাঁ।

জান না ত কত দিক সামলে কত চিন্তা-ভাবনা করে, কত সাবধানে প্রস্তুতি নিয়ে তবে আজ কাল আমাকে আসতে হয়। আজ সমাজ-জীবনে আমিও সাবালক, তুমিও সাবালক—, তাই দায়-দায়িত্ব ও উচিত-অনুচিত, লোক-নিন্দা কত কি সামলে আসতে হয়। এমন বয়সে ছেলেমানুষ ও স্কুলের ফ্রক্-পরা মেয়ে ত আর নেই, কত দিক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। মান হয়, অভিমান হয়, অবিশ্বাস ও সন্দেহ হয়, সবই বুঝি। কিন্তু সব কূল ঠেকিয়ে তবে এগোতে হয়—মহারাজ—তা জান?" দম ধরে আবার বল্ল—, "ডোমজুড়ের এক শয়তান মদন-মালীর চায়ের দোকানে বসে, আমার বড়দির পাশের বাড়ীর লোক—কি জানি কি মতলবে বসে আছে? থাকে থাকুক বয়ে গিয়েছে।" জ্যোতি তখন আড়ষ্ট ও শুকনো গলায় ঢোক-গিলে বল্ল—, "কেন কি হয়েছে?" সুলেখা—, "কিছু নয়, তোমায় শুনতে হবে না। আমি কি করি, কোথায় যাই, কার সঙ্গে মিশি? ইত্যাদি।" জ্যোতি—, "তবে তুমি আর এসো না আমার কাছে, যদি তোমার কোন ক্ষতি হয়!" সুলেখা আবার হেসে উত্তর দিল—, "বেশ সমাধান, আর তারই জন্যই কি এত প্রস্তুতি? একটা শুভ-খবর আছে তোমার জন্যে।" জ্যোতি "কি কথা।" সুলেখা—, "আমি আমতা বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজে যোগ দিয়েছি।" জ্যোতি আনন্দে দু-হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বল্ল—, "ভগবান নিশ্চয়ই শুনবেন, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি আরো বড় হও।" সুলেখা—, "আমার মঙ্গল তোমার মঙ্গল নয়?" জ্যোতি—, "নিশ্চয়, তোমার সব কিছু মঙ্গল আমার মঙ্গল, আমার আনন্দ। তুমি কত বড়! তোমার আনন্দে আমার আনন্দ হবে না?" সুলেখা—, "আর কিছু নয়? জ্যোতি একটু বোকা বোকা সুরে উত্তর দিল—, "আর কিছু মানে?" সুলেখা—, "এবার তৈরী হয়েছি—, প্রস্তুত থেকো যে কোন দিন তোমার ঘরে আসতে পারি।" জ্যোতি একটু বিস্ময়ে বলল—"সে কি বলছ লেখা! লোকে কি

বলবে ?" সুলেখা—, "লোকে যাতে কিছু না বলতে পারে, বা কিছু করতে না পারে তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আসবে। —যাক্ যখন যা হবার হবে। এই নাও আমার উপায়ের প্রথম টাকায় তোমার ও বিশু কাকার জন্তে কাপড় এনেছি। আর এত দিন বাবার পয়সায় মিষ্টি খাইয়েছি—, আজ আমার পয়সায় মিষ্টি-মুখ কর।" জ্যোতি দু-হাত পেতে কাপড়টা নিয়ে প্রথমে মাথায় ও পরে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্ল—, "আজ আমার সব চাইতে আনন্দের দিন।" এমন সময় বিশু এসে বল্ল—, "কি মা ? আজ কিসের আনন্দ ! কিসের দিন ?" সুলেখা—, "ওঃ কাকা এসেছ। ভালই হোল। এই নাও আমার উপায়ে আজ তোমাদের প্রথম কাপড় দিতে পারলাম।" বিশু—, "শুনেছি তুমি ও-পারে মাষ্টারী পেয়েছ, বেশ ! বেশ ! তা আমায় সব অত দিতে হবে কেন মা ? জ্যোতিকে দিলেই ত হ'ত।" সুলেখা—, 'কেন তুমি আমার কেউ নও ? আর শোন আমিও বোধ হয় তোমাদের কাছে আশ্রয় নিতে পারি। কারণ— আমার পিছনে শত্রু লেগেছে। তবে আমি মনে মনে তৈরীও আছি। তোমরা তৈরী থেকো আমায় আশ্রয় দেবার জন্য।" বিশু—"সে কি মা ? তবে তোমায় কেউ কিছু করতি পারবে না। ভগবান আছে। আর আমার ডানায় এখনও শক্তি আছে। এখনও বেশ হাল ধরি। কি বলব মা, যা ভাল কর।" সুলেখা বিশু-মাঝির হাতে মিষ্টির বাক্স দিয়ে বল্ল—, "নাও কাকা।" বিশু—, "তা তুমি মা আগা-গোড়া মিষ্টিই ত খাওয়াচ্ছ—, কিন্তু আমরা ত কিছুই দিতে পারি না,—তা এর থেকে তুমি দুটো নাও না মা !" সুলেখা—, "দেখ, অনেক কিছুই দিতে ইচ্ছা হয়, কি করে দিই। হাতের কাছে সহজে পয়সা দিয়ে যা পাওয়া যায় তাই মিষ্টিই এনে দিই।" বিশু—, "না-না মা, তা নয় গো ! অনেক মিষ্টি খাইয়েছ কিনা তাই বলছিলাম। আর কত দেবা রোজ রোজ।" "যাক কাকা, আজ চলি। তোমরা তৈরী থেকো।"—এই বলে সুলেখা চলে গেল।

এদিকে সুলেখা তার বাবা ও মায়ের জন্য কাপড় ও কিছু ফল এবং মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়ে তার মায়ের হাতে দিতে সুলেখার মা সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করলেন—, "এত সব কোথায় পেলি ?" সুলেখা—, "আজ আমার স্কুলের চাকরির প্রথম মাহিনার টাকা দিয়ে তোমার ও বাবার জন্যে কাপড় এনেছি—, তোমার পছন্দ হয় ?" মা—, "এত সুন্দর কাপড় পছন্দ হবে না কেন ? তা কি দরকার ছিল এত আনার ? যা, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে আয় ; বাড়ীতে লোক এসেছে।" সুলেখা—, "লোক এসেচে ত আমায় কি দরকার ? আমি আবার কি করব !" মা—, "তোকেই দেখতে এসেছে। তাড়াতাড়ি যা. কোন্ সকালেই এসে বসে আছে।"

এমন সময় মণিমোহন সরকার বাইরের বাড়ী হ'তে ভিতর-বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে—সুলেখাকে দেখে বলে উঠলেন—, "এই যে—, মা এসেছিস্ ? নে. তাড়াতাড়ি নে, ভদ্রতা রাখ।" সুলেখা—"কিসের ভদ্রতা ?" মণিমোহন—, "ঐ যে গুম্‌গড়ের বিমল হাজরা ! সকাল এগারোটা হ'তে নাছোড়বান্দা হয়ে বসে আছে—মেয়ে দেখবে, তার বড় ছেলের জন্যে। আমি অবশ্য বলেই রেখেছি ছোট মেয়ের আমি ঘরজামাই বিয়ে দেব। তা-তুই একটু কথা রাখ—, সামনে গিয়ে বস—।" সুলেখা—, "আচ্ছা—, যাচ্ছি যাও।" সুলেখা স্কুলের কাপড়-জামা না ছেড়ে একটু হাত মুখ ধুয়ে তাদের বাইরের বাড়ী বাবার ঘরে গিয়ে বসল। ওখানে আগে হতেই বিমল হাজরা ও তার শ্যালক মদন মণ্ডল বসেছিলেন।

সুলেখার বাবা বসেছিলেন সেখানে। সুলেখা যেতেই বিমল হাজরা বল্লেন—, "এস্ মা, এস্। বোস।" সুলেখা বড় তক্তাপোষের এক পাশে হাঁটু-ভেঙ্গে বসতে বিমল হাজরা জিজ্ঞাসা করলেন—, "তুমি আমায় চিনতে পার।" সুলেখা—, "হ্যাঁ। আমি যখন নাইনে পড়তাম তখন একবার বেতাই-ঘাটে নৌকায় আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।" বিমলবাবু—, "হ্যাঁ-হ্যাঁ ! তোমার দেখছি স্মৃতিশক্তি

খুব প্রখর। তা তুমি এখন বি, এ. পাশ করে স্কুলে মাষ্টারী করছ !" সুলেখা—, "হ্যাঁ।" বিমলবাবু—, "তা কত মাহিনা পাও ?" সুলেখার কান দুটো রাগে লাল হয়ে গেল ; উত্তর দিল—, "দেখুন এই মাসেই প্রথম মাহিনা পেয়েছি, আমার মা, কিম্বা বাবা কেউই জানতে চান্‌নি আমি কত পেলাম। তা আপনার ছেলে কি অক্ষম ?" বিমলবাবু থতঃমতঃ খেয়ে গিয়ে বল্লেন—, "না, না. এই মানে, মানে আর কিছু নয়। এই কথার কথা আর কি ? ?" বিমলবাবুর শ্যালক, একটু নড়ে-চড়ে বসে জিজ্ঞাসা করলে—, তা তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে থাকতে পারবে ত ? তোমার স্কুল একটু দূর হবে কিনা ! তা যাই হোক পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবেখোনি।" সুলেখা—, "ওঃ আপনারা বুঝি শোনেন নি, আমার বাবা ঘর-জামাই বিয়ে দেবে। তবে ত কোথাও থাকার প্রশ্নই উঠে না।" বিমলবাবু ও তাঁর শ্যালক আর এক দফা ধাক্কা খেয়ে কোন রকমে নিজেদের সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন—, "হ্যাঁ-হ্যাঁ ! তোমার বাবার এ-রকমই একটা ইচ্ছা বটে এবং প্রথমেই তা বলেছেন।" বলেই চট্‌করে মুখ ফস্‌কে বলে ফেল্লেন—, "তা আমাদের ছেলেই না হয় পরে এখানে থাকবে !" সুলেখা—, "কিছু মনে করবেন না. আমি একটা কথা বলছিলাম—," ।

বিমলবাবু ও তাঁর শ্যালক একই সঙ্গে বলে উঠলেন—. "বল ! বলতে কি দোষ !" সুলেখা—, "অপরাধ নেবেন না, আপনাদের বড় ছেলে, তাতে আপনাদের অবস্থাও ভাল শুনেছি, এহেন অবস্থায় কোন বাবা-মা চান না তার বড়ছেলেকে ঘর-জামাই দেয়। কে ঘর-জামাই হয় ! যাঁর কেউ নেই, অথচ ভাল ছেলে, নিজের বাপের চাল-চুলো কিছুই নেই সেই শ্বশুরের ভিটাকে নিজের ভিটা বলে মেনে নিতে পারে। আর প্রথমে আমি কত মাহিনা পাই জানতে চাইলেন, এবং আমার বাবার সম্পত্তি আমায় কত দেবে তাও শুনেছেন—, আমার ত মনে হয় ছেলে বিক্রি করে স্থায়ী আয় ও সম্পত্তি কিনতে

এসেছেন। তা আমি কিন্তু কাউকে কিনতে চাই না। তাতে স্থায়ী শান্তি বজায় থাকে না। আমি কারুরই হ'তে চাই।" বলে একটা নমস্কার দিয়ে উঠে চলে এল। কনে দেখতে এসে বিমলবাবু ও তাঁর শ্যালকের বেশ দক্ষিণা হয়েছে। তাঁরা আর বেশীক্ষণ থাকতে পারেন নি, 'বেলা গেল' এই অজুহাতে পালিয়ে বাঁচলেন। এদিকে মণিমোহন সরকার ভিতর বাড়ীতে গিয়ে মেয়েকে বকতে লাগলেন—, "তোর মত তোর দিদিরা কেউ নয়। তাদের মুখে কোন কথা সরত না। ভয়ে কাঁপত, আর তোর মুখে খই ফোটে। মানুষের মান রেখে এবং বুড়ো-মানুষ বলেও সমীহ করে কথা বলতে হয়।" সুলেখা একটু হেসে ফেলে উত্তর দিল—, "বাবা, আমি গুম্‌গড়ের বিমল বুড়োকে চিনি। আমি যখন নাইনে পড়ি তখন থেকে আমার পিছনে লেগে আছে। সে কি শুধু আমার জন্যে? দেখলে না প্রথমে—আমি কত মাহিনা পাই। আর তোমার সম্পত্তি। ভীষণ লোভী। ওদের এমন কথা বলেই উচিৎ শিক্ষা দিতে হয়।" মণিমোহনবাবু—, "না, অত শিক্ষা ভাল নয়। আমারও তো ওখানে মতই নেই, তবে ভদ্রতা রাখব না কেন? মেয়েছেলে—, কার কি কপালে আছে বলা যায়? তাই একটু নম্রও হ'তে হয়।" সুলেখা আর কোন কথার উত্তর না দিয়ে মাকে উদ্দেশ্য করে বল্ল—, "বড় খিদে পেয়েছে মা, কি দেবে দাও! "সুলেখার মা" সুলেখার আনা নূতন কাপড় দুটো তাঁর স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—"এই নাও, মেয়ে প্রথম মাসের মাহিনার টাকায় তোমার আমার জন্যে কাপড় এনেছে।" আর সুলেখার আনা কটা সন্দেশ দুটো প্লেটে করে একটা স্বামীকে ও একটা মেয়েকে দিয়ে বল্লেন—, "ধর, তোমার মেয়ের আনা মিষ্টি।" মণিমোহন সরকারের মুখভাবটা পাল্টে গিয়ে—অনেক নরম হয়ে কাপড় ও মিষ্টির প্লেটটা হাতে নিয়ে বল্লেন—, "মা-এর আমার সব বুদ্ধিই ভাল—, তবে বড় উচিত বক্তা! স্বামীর ঘরে এত উচিৎ বক্তা হলে শান্তি থাকে না। সত্যি হলেও অপ্রিয় সত্যি বলতে নেই।" মণিমোহন বাবুর স্ত্রী উত্তর দিলেন—, "স্বামীর

ঘর হ'লে সব মেয়েই তা বোঝে। যেমন তোমার গুণের কথা বলতে গেলে তোমার ভাল লাগে না।" মণিমোহন—, "তোমার জ্বালায় আমার দেখছি কথা বলাই বন্ধ করতে হবে।" স্ত্রী—, "নাও, কিছু আর বন্ধ করতে হবে না। এখন বাপ-বেটি হাত মুখ ধুই চালও ত দয়া করে, আমায় রেহাই দাও।"

এদিকে সুলেখার বড় জামাইবাবুর ছোট ভাই অরুণ সুলেখাকে যে বিবাহের প্রস্তাব তার বড় বৌদি ও দাদার মাধ্যমে পাঠিয়েছিল—, সেই প্রস্তাব সরাসরি সুলেখার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জ্বালা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তাই তাব এক বন্ধু 'ঝণ্টুকে' সে লাগিয়েছে সুলেখা কোথায় যায়—, কার সঙ্গে মেশে, এই সব অনুসন্ধানের জন্য! সেই ঝণ্টু বেতাই ঘাটের মদন মালীর চায়ের দোকানে গুপ্তচর লাগিয়ে অনুসন্ধানে জানল—, "সুলেখা অন্ধ-জ্যোতির বাড়ী মাঝে-মধ্যে যায়, এবং তাকে মাঝে মধ্যে খাবার ও পোশাকআসাক দিয়ে সাহায্য করে।" এই খবরে শুনে অরুণ চিন্তা করল—, "এ কি করে সম্ভব! সুলেখার মত মেয়ে একটা অন্ধ ছেলেকে ভাল-বাসবে? হয় ত অন্ধ বলেই তাকে সহানুভূতি ও মমতা বা দয়া করে মাত্র।"

সুলেখার রূপে অন্ধ অরুণের মনের সন্দেহ তবুও গেল না। তাই সে নিজে এসে মাঝে মধ্যে ঘাটে এসে চর দিতে লাগল। জ্যোতিকে অরুণ দেখল—, জ্যোতি সুপুরুষ, ব্যবহার ভদ্র, এবং অতি শান্ত প্রকৃতির মানুষ। অরুণের মনের সন্দেহ আরো বাড়লো। তবে কি সুলেখা জ্যোতির রূপেই মুগ্ধ! কি জানি? অন্ধ-অক্ষম সহায়-হীনের রূপ নিয়ে কি হবে?........তবুও কি জানি, গুণের আঁধার স্বয়ং সরস্বতী নিজে গন্ধ-হীন পলাশ-কাঞ্চনের রূপে এত মুগ্ধ! তিনিও ত নারী। আর মানবী চরিত্র সে ত দেবতারও অজ্ঞেয় বিষয়!—" যাক—, অরুণের মনের জ্বালা আর কিছুতেই যাচ্ছে না। তাই সে

হালও ছাড়ছে না। সে জানতে চায় সুলেখা যাকে ভালবাসে—সে কোন গুণে গুণী, কোন ধনে ধনী!

এইভাবে বেশ কয়েক মাস যাবার পর—এটাও একদিন অরুণ বিকালে চারটের পর দেখতে গেল—, সুলেখা তার স্কুল হ'তে বাড়ী ফিরছে, আর জ্যোতিও এপার হ'তে একটা ওষুধের শিশি হাতে করে নৌকার উদ্দেশ্যে ঘাটে আসচে। সুলেখা আগে হ'তে খেয়ার নৌকায় উঠে বসে আছে। জ্যোতিকে আসতে দেখে বিশু-মাঝি হাঁক পাড়ল—, "তাড়াতাড়ি আয় বাবা, খেয়া ছাড়ব।" জ্যোতির গায়ে বেশ জ্বর, সে তার হাতের লাঠি নিয়ে তাড়াতাড়ি হাতড়ে আসতে গিয়ে তার হাতের ঠায়োরটা ফোসকে গিয়ে নৌকার মাথায় এসে আছড়ে পড়ল। অরুণ এপারে ঘাটে দাঁড়িয়েছিল। সে অপেক্ষায় ছিল কি হয় দেখার। জ্যোতি পড়ে যেতেই সুলেখা যতটা পারল নৌকার অপর মাথা হ'তে তাড়াতাড়ি এসে জ্যোতিকে তুলে ধরল। কিন্তু জ্যোতির মাথায় বেশ আঘাত লাগল। কপালটা সঙ্গে সঙ্গে ফুলে নীল হয়ে গেল। সুলেখা নিচু হয়ে নদী হ'তে জল নিয়ে জ্যোতির কপালে বার বার জল নিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল—, "ইস্ গায়ে এত জ্বর! এই জ্বর নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?" জ্যোতি—, "কে? লেখা? কাল রাত্রে ভীষণ জ্বর হয়েছিল—, আজও জ্বর ছাড়েনি—তাই বিশু কাকা এপার হ'তে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ আনতে বলেছিল।" বিশু—, "তাই বলে তোকে এত তাড়াতাড়ি অসাবধানে উঠতে বলেছি?" জ্যোতি—, "তুমি যে তাড়াতাড়ি আসতে বল্লে—! ভাবলাম খেয়ার দেরী হচ্ছে।" বিশু—, "তাড়াতাড়ি মানে—আসতে বলেছি, তোকে তাই বলে তাড়াতাড়ি করতে বলেছি! সুলেখা বল্ল—, "যাক্‌গে কাকা, যা হবার হয়েছে—; ওষুধটা ত পড়ে নষ্ট হ'ল! তুমি বরঞ্চ পরের খেয়ায় গিয়ে ওষুধটা ও কিছু ফল এনে দিও।" বলে তার সাইড ব্যাগ হ'তে একটা দশটাকার নোট বিশুর হাতে দিল। এমন সময়

অরুণ নৌকায় উঠে সরাসরি সুলেখাকে আক্রমণ ও অভিযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করল—"এই অন্ধ-জ্যোতি তোমার কে যে তার প্রতি এত দরদ ?" সুলেখা একবার মুখ তুলে দেখে নিল—অভিযোগকারী স্বয়ং তার বড়দির ছোট দেওয়র অরুণ বিশ্বাস। মুহূর্তে সুলেখার মুখখানা কঠিন হয়ে গেল এবং অরুণের মুখের উপর স্পষ্ট উত্তর দিল—. "অন্ধ জ্যোতি আমার কে, সে কথার উত্তর আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই। চোখ রাঙিয়ে কৈফিয়ৎ করতে হয়, তোমার বাড়ীর মেয়ে-বৌকে করোগে। তারা তার কৈফিয়ৎ দেবে—, কারণ তারা তোমাদের খায়। আমি কারো কৈফিয়তের ধার ধারি না।" অরুণ—, "তা ধার ধারবে কেন ? একটা পথের ভিখারী-অন্ধের সঙ্গে প্রেমে একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছো কিনা ?" সুলেখা—, "মুখ সামলে কথা বলবে. চোখ থাকতে যারা আত্ম-সুখ ও স্বার্থ ছাড়া কিছু দেখে না বা বোঝে না—পথে কে মরল বা পড়ল চোখে দেখেও যারা চোখ ফিরিয়ে থাকে—, তাদের মত হীন এক-চোখোকেও ধিক্!" অরুণ আর থাকতে না পেরে—যত রাগ ও হিংসা গিয়ে পড়ল জ্যোতির উপর। তাই জ্যোতির দিকে তেড়ে এসে বল্ল—, "একটা পথের অন্ধের স্পর্দ্ধা কম নয়, সাহস কম নয়, সে একটা ভদ্র ও শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে।" সঙ্গে সঙ্গে সুলেখাও পায়ের চটি খুলে হাতে তুলে উত্তর দিল—, "খবরদার! সভ্যতা বা ভদ্রতার যা নমুনা দেখিয়েছ--তাতে আর এক পা এগুলেই মান রাখব না।" নৌকার আর পাঁচজন হতভম্ব। পরে অরুণ যখন জ্যোতিকে তেড়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন—, "এ কি করছেন আপনি ? একজন অন্ধ ব্যক্তি, তাতে গায়ে, জ্বর, এবং উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে—তাকে যদি উনি হাত ধরে তুলেই থাকেন—, তাতে কি এমন অন্যায় হয়েছে ? এটা ত সকলের করা উচিৎ। আপনারও তেড়ে না এসে এটাই করা উচিৎ ছিল। আপনি একি আচরণ করছেন ?" জ্যোতি নৌকার এক পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে বিবর্ণ মুখে

মুখে বার বার চোখের পলক ফেলছে। যেন বুঝতে চায়, যেন দেখতে চায়—এ কি ঘটে যাচ্ছে। সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—, "ওকে নৌকা হ'তে নামিয়ে দিন, বদ-স্বভাবের লোক—, পিছু লেগে পাত্তা না পেয়ে আক্রোশ—এই অসভ্যতা।" নৌকায় কয়েকটা অল্প বয়সের স্কুলের ছেলে-মেয়ে ছিল—তাদের মধ্যে একজনে 'ফিক্' করে হেসে ফেলায় মনটা হাল্কা হওয়ায় একজন বলে উঠল—, বেশ হয়েছে মশায়! এবার দয়া করে নৌকা হ'তে নামুন, নৌকা— ছাড়ুক্, আমরা যাই, কোন সকালে বেরিয়েছি মশায়—আর ধাস্‌টোমো ভাল লাগে না।" অরুণ রীতিমত অপমান ও অপদস্থ হয়ে "আচ্ছা! দেখে নেব" বলে গোঁ-গোঁ করতে করতে নেবে যেতে বিশু নৌকা ছেড়ে দিল। এপারে ঘাটে নৌকা লাগলে যে যার নেবে গেল। জ্যোতির হাত ধরে সুলেখাও নৌকা হতে নামল। এবং উপরে উঠে জ্যোতিকে সেদিন একাই তার বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিল, সেদিন আর সঙ্গে গেল না। কেবল বল্ল—, "সাবধানে থাকবে—, ওষুধ খাবে, আর কপালে একটু ঠাণ্ডা-জলের পটি দেবে।" সুলেখার মনটা আজ স্বাভাবিক কারণেই ভাল নয়। সে মনের তরফে প্রস্তুত ছিল না—এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে। তাতে তার বড়দির বাড়ীর আত্মীয়। ভাবতে ভাবতে সুলেখা বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল—, "ঘটনা কত দূর গড়ায়।"

ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে গেল। পরদিন সুলেখা স্কুলে গিয়ে দেখল, মেয়েরা কানা ঘুষা করছে—গতকালের জ্যোতি-সুলেখা-অরুণের নৌকার উপর কথোপকথন নিয়ে। সুলেখা গম্ভীর হয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে তার ক্লাস নিতে গেল। টিফিনে শিক্ষিকা-সাধারণ বিশ্রাম ঘরে যখন অন্যান্য শিক্ষিকাগণ এসে মিলিত হলেন—, তখন প্রধান শিক্ষিকা সুলেখাকে ডেকে গতকালের ঘটনা জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—, "সুলেখা গতকাল কি হয়েছিল" ঘাট পার হতে গিয়ে?" সুলেখা আনুপূর্বিক সংক্ষেপে ঘটনাটি বল্লে। প্রধান

শিক্ষিকা প্রেমলতা দেবী খানিকখন্ চুপ থেকে বল্লেন—, "কি অসভ্য বর্বর, তাতে তোমাদের আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে, যাক্—ভয় পেয়ো না। কোন ভয় নেই—আমরা ত আছি।" প্রধান শিক্ষিকা পরে সুলেখাকে একান্তে আলাদা ভাবে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—, "আচ্ছা সুলেখা, তোমার কি ঐ দৃষ্টিহীন ভদ্রলোকের প্রতি কেন দুর্বলতা আছে!" সুলেখা মাথা নিচু করে মাটি পানে তাকিয়ে উত্তর দিল—, "হ্যাঁ বড়দি! আমি ছোটবেলা হতে জ্যোতিকে সহানুভূতির ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখি।" প্রধান শিক্ষিকা খানিক চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—, "ঐ দৃষ্টিহীন অক্ষম-ভদ্রলোককে নিয়ে সংসার জীবনে তুমি সুখী হ'তে পারবে?" সুলেখা—, "সে কথা ভেবেই আমি স্বাবলম্বী হ'তে চেষ্টা করেছি, স্বামী যদি বিবাহের পরই অন্ধ হ'তেন তখন কি তাঁকে অবহেলা বা জীবন হতে বাদ দেওয়া যেত? যদি একজন শিক্ষিত পুরুষ-মানুষ উপার্জনশীল হয়ে একটি অশিক্ষিত বা অক্ষম অর্থাৎ আর্থিক স্বাবলম্বীতাহীন নারীকে নিয়ে জীবনে সুখী হ্তে পারেন, তবে কেন একটি নারী শিক্ষিতা হয়েছে বলে একজন হৃদয় বান-অক্ষম পুরুষকে গ্রহণ করে সংসারে সুখী হ'তে পারবে না দিদি! আর না পারাটাও কি একটা স্বার্থপরতা নয়?" প্রধান শিক্ষিকা—, "যদি তোমার মনোবল ঠিক্ থাকে, আর এমন একটা আদর্শ সত্যি হয় তবে ঈশ্বর তোমার সহায় হোন্। আমরা বিশেষ করে আমি যতদূর পারব তোমার পাশে আছি। কোন ভয় নেই। সাবধানে থাকবে।" সুলেখা বড়-দিদিমণিকে প্রণাম জানিয়ে টিফিনের পর আর বাদ-বাকি ক্লাস নিয়ে সোজা তার বাড়ী চলে এল, ঘটনা কানা-কানি হয়ে অনেক দূর গিয়েছে। এমন কি গুমগড়ের বিমলবাবুর কানেও গেল। বিমল বাবু দেখলেন এই সুযোগ। "তুমি মেয়ে বড় অপমান করেছিলে সেদিন! একটা অন্ধের সঙ্গে প্রেমে অন্ধ হয়ে আছ, আর সে দিন বড়-বড় কথা বলেছিলে?" মনের সুখে ঝাল মিটিয়ে খরিওপের মণিমোহন সরকারকে একটা চিঠি লিখলেন,

যার সারমর্ম—, "আপনার মেয়ে একটা অন্ধের প্রেমে-অন্ধ হয়ে আছে। সে আমাদের মত সংসারী লোকের ছেলেকে দেখবে কি করে ?" ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এদিকে চন্দ্রলেখা তার দেওয়ের মুখে ঘাটে সুলেখার কথা-ও তার মেজাজ, বাড়িয়ে কমিয়ে অনেক খানা হ'য়ে শুনেছে। সে ত ছোট বোনের প্রতি মনের সাধ মিটিয়ে ইতি পূর্বের অপমানের প্রতিশোধ তুলে একটা কড়া চিঠি হাঁকাল বাবার উদ্দেশ্যে—, "বাবা ! তোমার আদরের শিক্ষিতা-মাষ্টার মেয়ে আমাদের মত সংগতিসম্পন্ন মানী ঘরে সংসার-ঘানিতে 'কলুর বলদ' হবে কেন ? সে প্রেমে অন্ধ হয়ে তোমার মান, সম্মান, বংশ-মর্যাদা, ও সমাজের গালে কালি দিয়ে একটা পথের-ভিখারী অন্ধের পাল্লায় পড়ে বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা সব হারিয়ে অন্ধের সাথে অন্ধ হয়েছে।" ইত্যাদি-ইত্যাদি—। চিঠি দুটো পর পর দুদিনে মণিমোহন বাবুর হাতে এসে পড়ল। এদিকে দেখতে দেখতে ঐ ঘটনার পর সাত-আট দিন গত হল। প্রথম দিনে গুম্‌গড়ের বিমলবাবুর চিঠিটা পেয়ে বিস্ময়ে স্ত্রীর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—, "এটা কি নিছক শত্রুতা—, না আর কিছু ?" স্ত্রী উত্তর দিলেন—, "ক্ষিপ্ত হয়ো না, চিন্তা কর, যাচাই কর কতদূর সত্য। মেয়েকে আগে কিছু বলো না। না শুনে, না জেনে বলাটা ঠিক হবে না।"

কিন্তু দ্বিতীয় দিনে নিজের বড়-মেয়ে চন্দ্রলেখার হাতে-লেখা চিঠি পেয়ে মণিমোহন বাবু রাগে গুম্ হয়ে স্ত্রীকে চিঠিটা দিয়ে বল্লেন—, "দেখ মেয়ের গুণ। লেখা-পড়া শিখিয়ে শেষে এই ফল। এই বিদ্যের পরিচয় দিল। আমার আত্মীয় বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত করল।" মণিমোহন বাবু ও তাঁর স্ত্রী যখন দ্বিতীয় চিঠিটা নিয়ে এই সব আলোচনা করছিলেন—তখন ভরা দুপুর বেলা। সুলেখা স্কুলে, সে কিছুই জানতে পারল না। সুলেখা প্রতিদিনের মত স্কুল হ'তে বাড়ী ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে—, হাত-পা ধুয়ে মায়ের কাছে খাবার চাইল—, "মা আজ একটু চা-ও দিও।"

মা চা ও জলখাবার বাড়ীর কাজের একটি ছোট মেয়ের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সুলেখার একটু আশ্চর্য্য লাগল—, "মা ত কোন দিন অন্যের হাতে দিয়ে তাকে খেতে দেয় না! তবে কি—? ....আবার ভেবে নিল—সবদিন সমান যায় না; নিশ্চয় মায়ের হাতে আজ কাজ আছে।" এই সব ভেবে সে নিজের ঘরে বসেই তার চা জলখাবার খেয়ে নিল। কিন্তু অনুভব করল বাড়ীখানার বড় আজ থম্‌থমে ভাব। কোন সাড়া-শব্দ বা প্রাণের স্পন্দন নেই। কিন্তু সুলেখা আগামী কাল হ'তে আগামী দশদিনের জন্য প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছে। সঙ্গে যাবেন প্রধান শিক্ষিকা। কাজেই রাত্রে সে তার জামা-কাপড়, মাজন-ব্রাস, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং পথখরচা যা দরকার সবই গুছিয়ে নিল। আর একটা ছোট বেডিং নিল। সকালে দুটো খেয়েই সে বেরিয়ে পড়বে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে সুলেখা তার ঘরে শুয়ে পড়লে—সুলেখার মা তাঁর স্বামীকে বার বার বলতে লাগলেন, "আগামী কাল হ'তে দশ-দিনের জন্যে স্কুলের ব্রতচারি ট্রেনিং-এ যাচ্ছে, এখন কিছু বলো না। ঘুরে আসুক, তখন যা-হয় করো। আর আগে ঘটনাটা নিজে জেনে দেখ তার পর যা হয় করো।" মণিমোহন রাগে গর্ গর্ করতে করতে স্ত্রীকে ধমকের সুরে বল্লেন—, "বল কি? এর পরও কিছু বলব না—? ঐ মেয়ের জন্যে মান থাকল! সমাজে মুখ থাকল! বড়-মেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে আর মুখ পাবে? ও আমার আত্মীয়-কুটম্ব-সব চটাল। আর সহ্য করা চলে না। ওর যা-খুশি করুক আমার বাড়ীতে আর যায়গা হবে না।" স্ত্রী বার বার তবুও বোঝাতে লাগলেন, "কিছু হটকারিতা করলে ফল ভাল হবে না।" মণিমোহন—, "যথেষ্ট ফল ফলেছে—আর কোন সুফলে আশা করি না; বা ভয়ও করি না।" স্ত্রী—, "তবে যা হয় কর, এখন অনেক রাত হয়েছে—শোও।"

পরদিন সকালে উঠে সুলেখা তৈরী হচ্ছে, এমন সময় বাড়ীর কৃষাণ ভোলা ভেতর বাড়ী এসে বল্ল—, "কই গো দিদিমণি! তোমার

কি কি নিয়ে যেতি হবে?" সুলেখা তার বেডিংটা ও জামা-কাপড়ের সুট্‌কেসটা ভোলাকে দেখিয়ে বল্ল—, "আমতার মেয়েদের স্কুলের বারান্দায় এই দুটো দিয়ে এসো। দেখবে আরো মেয়েরা ওখানে আছে। আমার নাম করে ওদের কাছে রাখলে—ওরা যত্ন করে রাখবে।" ভোলা বেডিংটা মাথায় নিয়ে এবং সুটকেস্‌টা হাতে নিয়ে রওনা দিল। সুলেখা সকাল সকাল স্নান-আহার সেরে কাপড়-চোপড় পরে তৈরী হয়ে নিল। তাকে সকাল আট্‌টার মধ্যে বাড়ী হ'তে বার হ'তে হবে। সুলেখা মাকে প্রণাম করল, কারণ দশ দিনের জন্য বাড়ি হ'তে যাচ্ছে। বাবাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে এমন সময় মণিমোহন বাবু বাইরের বাড়ী হ'তে ভেতর-বাড়ী ঢুকতেই সুলেখার মুখোমুখি হলেন এবং একটু কঠোর-স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন—, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" সুলেখা একটু বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে উত্তর দিল—, "কেন? তুমি ত জান, আমি স্কুলের হ'য়ে দশ-দিনের জন্যে ব্রতচারী ট্রেনিং-এ যাচ্ছি।"

মণিমোহন বাবু—, "তোমায় যেতে হবে না।" সুলেখা—, "সে কি কথা? সব ঠিক্‌ঠাক্, আর মানুষের একটা কথার ত দাম আছে! দিদিমণিদের মধ্যে আমিই একা হেড্-মিস্‌ট্রেসের সঙ্গে যাচ্ছি।" মনিমোহন বাবু—, "না! তোমার আর স্কুলের মাষ্টারীতেও দরকার নেই। সুলেখা আরো বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—, "কিন্তু কেন? কি হ'ল?" মণিমোহন বাবু—, "হঠাৎ নয়—, আমিই তোমায় বিশ্বাস করে ভুল করেছি। এই দেখ! তবুও কি তুমি স্বীকার করবে না—এই ঘটনা সত্য নয়!" বলে বড় মেয়ের দেওয়া ও বিমলবাবুর দেওয়া দু-খানা চিঠিই সুলেখার হাতে তুলে দিলেন। সুলেখা—এক নজরে চিঠি-দুটোয় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে তার বাবাকে উত্তর দিল—, "ঘটনা সত্য, তবে এরা যা লিখেছে সব বাড়াবাড়ি।" মণিমোহন বাবু—, "তবুও তুমি অস্বীকার করছ?" গলার স্বর একটু চড়িয়ে—, "আবার মুখের

উপর কথা বলছ? লজ্জা করছে না!" সুলেখা—, "সত্যকে—অস্বীকার করতে আমি শিখিনি। তাই প্রথমেই স্বীকার করেছি—, ঘটনা সত্য। আর সেদিন এমন কিছু অন্যায় আমি করিনি—যাতে আমার লজ্জা করবে।" একটু দম নিয়ে আবার বলে চলল—, "সেদিন জ্যোতির অসুখ করেছিল, তাই সে সেদিন ওপার হ'তে তার ওষুধ নিয়ে ফিরছিল, নৌকায় উঠতে গিয়ে জ্বরের ঘোরে টলে আছড়ে নৌকার উপর পড়ে যায়। কপালে লেগে ফুলে উঠে, তাই কপালে একটু জল দিয়ে হাত-ধরে টেনে তুলেছিলাম। আর ওষুধটা পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে—বিশু কাকাকে আবার ওষুধ এনে দিতে বলি—, এটাই আমার সে দিনের অপরাধ। আর অরুণ দাঁড়িয়ে দেখছিল—, সহ্য করতে না পেরে জ্যোতিকে তেড়ে মারতে আসে; আমি তাকে সাবধান করেছিলাম—, আর নৌকার আর আর সকলে তখন ওকে নৌকা হ'তে নামিয়ে দেয়।—তারই ঝাল মিটিয়েছে। বিমল বাবুও না পাওয়ার ঝাল তুলেছে।" সুলেখার বাবা গলার স্বরটা একটু নামিয়ে উত্তর দিলেন—, "তবুও ওরা আমার আত্মীয়-কুটুম্। জ্যোতি ওদের চাইতে আমার বড় নয়। তুমি বেরিয়েছ যখন ঘুরে এস্। তবে তোমার আর মাষ্টারী করতে হবে না। বেশী লেখাপড়া শিখে তুমি বিবেক-বিবেচনা সব হারিয়েছ। অন্ধের সংস্পর্শে এসে তুমিও অন্ধ হয়েছ। মনে রেখো—আমি ও-সব প্রশ্রয় দেব না। আর যদি আমার অবাধ্য হও— তবে জানবে আমার বাড়ীতে তোমার আর স্থান নেই।" সুলেখার মা স্বামীকে আবার তিরস্কারের সুরে বল্লেন—, "এখন মেয়েটা কটা দিনের জন্যে বাড়ী ছেড়ে বেরুচ্ছে, এখন তোমার এই নীতি-উপদেশ না দিলে নয়? কেন ও ফিরে এলে বলতে পারতে না?" আবার মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন—, "রাগ করিস্‌নে, শোনা কথায় এমন রাগ হয় মা। তাতে নিজের কুটুম-বাড়ী হ'তে অভিযোগ এলে, তা যাক্ বাবা ছাড়া কে বলবে? সাবধানে যাস্। আর সাবধানে

থাকিস্।" সুলেখা মায়ের স্নেহের সুরে আর চোখের জল সামলাতে পারল না, কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে পিছন ফিরে আমতার স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। সুলেখা চলে যেতে সুলেখার মা আবার তাঁর স্বামীকে তিরস্কার করলেন—, "ভুল তুমি চিরকাল করে এসেছ। এটা তোমার দ্বিতীয় ভুল। আমি প্রথমেই বলে-ছিলাম—, অত না পড়িয়ে—এবার বিয়ে দিয়ে দাও। লেখাপড়া শেখালে মনের সঙ্গে বিবেকেরও চোখ-ফোটে। সেখানে হাত বাড়ান যায় না—, আর আজ যদি কিছু ঘটে থাকে তবে সে ভুলের মাশুল তোমায় শোধরাতে হবে।" মণিমোহন স্ত্রীর তিরস্কারে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে চুপ করে বাইরের বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। বার বার তার মনে পড়তে লাগল—"মেয়েটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল চোখের জল ফেলতে ফেলতে।"

সুলেখার মনটা ভারাক্রান্ত, পথে চলতে চলতে ভাবতে লাগল— "তার চরম শত্রু শেষে তার বড়দি ও তার দেওয়র অরুণ!" কিন্তু দিদির কাছে শেষে ছোট বোনের চাইতে ছোট দেওয়র এত বড় হ'ল— ! যে, তাকে দিয়ে শেষে পথে-ঘাটে অপমান করতে ছাড়ল না— এবং শেষে কিনা তারই কথায় বাবার কাছে সত্য-মিথ্যা লাগিয়ে বাবার মনটা চটিয়ে বাবাকে দিয়ে আমাকে তিরস্কার ও অপমান করাল!" বার বার বাড়ী হ'তে বেরোবার সময় বাবার একটি কথাই তার কানে বাজতে লাগল—, "লেখা-পড়া শিখে তুমি বিবেচনা হারিয়েছ। অন্ধের সংস্পর্শে এসে তুমিও অন্ধ হয়েছ, মনে রেখ— আমি এসবের প্রশ্রয় দেব না। আর যদি আমার অবাধ্য হও!— তবে জানবে আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নেই।"—কথা কটা ভাবতে গিয়ে তার চোখের জল ছাপিয়ে চলার পথটা ঝাপসা হ'য়ে এল। সুলেখা তার চোখ-দুটো আবার আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে তার পথ এগিয়ে চল্ল। আবার ভাবতে লাগ, "অন্ধ হওয়া এত অপরাধ? অন্ধত্ব কি মানুষের সাধ! আর যাদের চোখে

আলো আছে তারা এত নিষ্ঠুর! এত স্বার্থপর! আমার বাবাই ত বলেছেন—জ্যোতির বাবা তিনকড়ি সামন্ত তাঁর অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু ছিলেন। আমাদের পালটা ঘর, জ্যোতি লেখাপড়ায় ভাল ছিল— ; সে জন্মান্ধও নয়। অথচ সেই বাবাই তাকে খেঁাটা দিলেন—, "অন্ধের সংস্পর্শে—তুমিও অন্ধ হয়েছ।" সুলেখার চোখে এবার চোখের জলের পরিবর্তে এনে দিল জেদের আগুন। চোখ-দুটো তার জ্বলে উঠল—এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়—, না! হার মানতে আমি শিখিনি। হার আমি মানব না। আমি ত অন্যায় কিছু আজো করিনি। অপরাধ—একটা পথের দৃষ্টিহীন গুণী গায়ককে ভালবেসেছি। আমি ত বাবার অর্থ চুরি করে গহনা নিয়ে পাড়ার বা কোন ভালবাসার কাউকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি না। এমনকি অরুণের মত স্বার্থপর-হীন, অর্থসর্বস্ব দুশ্চরিত্র, বড় লোকের ঘরে তাকে আরো ধনী করার জন্য, তার বাবার সোনাদানা, অর্থের পণ নিয়ে উঠেনি। একজন সর্বহারা নিঃসহায় সম্পদ শূন্য দৃষ্টিহীনকে ভালবেসে তাকে আশ্রয় করে ঘর-বাঁধতে চেয়েছি—তাকে সান্ত্বনাও বাঁচার আলো দেবো বলে।" এই সব ভাবতে ভাবতে সুলেখার মুখটাও কঠিন হয়ে উঠল। কাঁধের সাইড্ ব্যাগটা একবার ঠিক্ করে নিয়ে—আঁচল দিয়ে বসন্তের দক্ষিণা বাতাসেও তার কপালের ঘাম মুছল। মনে মনে ঠিক্ করে ফেল্ল—, "আগে জ্যোতির বাড়ী যাব, তাকে সব বলব আজ—, আর বাড়ী ফিরব না। জ্যোতিকে সে আইনগত ভাবে বিবাহ করবে।" এই সব ভাবতে ভাবতে রাগে সুলেখা বেত্তাই ঘাটে এসে পেঁাছে গেল। এবং তার হুঁশ হ'ল, "তাই ত জ্যোতির সঙ্গে দেখা করতে হবে।" সে কথা ভেবেই সোজা জ্যোতির ঘরে গিয়ে দেখল বিশুকাকা রান্না করছে এবং জ্যোতি বারান্দায় বসে। সুলেখাকে হন্ত-দন্ত হয়ে আসতে দেখে বিশু-মাঝি ব্যস্ত হয়ে আসন দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—, "মা আমার এত ব্যস্ত কেন, কোথায় বেরিয়েছ? মুখখানা কালো হয়ে ঘাম ঝরছে।" সুলেখা, আবার মুখখানা শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে উত্তর

দিল—, "কাকা! আমি বড় ব্যস্ত। দশদিনের জন্য স্কুলের একটা ট্রেনিং-এ যাচ্ছি। তবে তুমি এত সকালে রাঁধছ কেন?" বিশু—, "জ্যোতি একটা স্বর হ'তে উঠল—, সে বেলা দুপুরে দুটো ভাত পায় না, তাই আজকাল সকালেই দুটো ভাতে সেদ্ধ ভাত রেঁধে ওকে দিয়ে পরে ঘাটে যাই।" সুলেখা কোন কথা না বলে সব চেপে গিয়ে শুধু বল্ল—, "আজ হ'তে ঠিক দশদিন বাদে অর্থাৎ ২০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার তুমি অবশ্যই ওকে সঙ্গে করে হাওড়ায় যাবে। এবং ঠিক হাওড়া ষ্টেশনের অনুসন্ধান অফিসের সামনে বসে থাকবে। মনে থাকবে ত?" বিশু হতবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করল "কেন মা! হঠাৎ.........।", কথা শেষ না করতে দিয়ে সুলেখা আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বল্ল—, "ওঃ আমি যা বলছি শোন! আমি ওকে দেখাব। পারবে কিনা তাই বল।"

কিন্তু কোন দিন সুলেখাকে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে ধমকের সুরে আদেশ করতে শোনেনি। তাই অনুগতের মত উত্তর দিল, "নিশ্চয় পারব মা। কেন পারব না! নিশ্চয় জ্যোতিকে সঙ্গে করে হাওড়ার ইষ্টশনে সকাল দশটার মধ্যে পৌঁছাব।" সুলেখা—, "তবে আমি আজ যাই, আমার জন্যে আরো অন্যেরা স্কুলে অপেক্ষা করছে।" বলেই জ্যোতির সঙ্গেও কোন কথা না বলে কেবল—, "তোমরা সাবধানে থাকবে" বলেই চলে গেল। জ্যোতি ও বিশু ভেবে নিল, জ্যোতির অসুখ করেছিল—তাই ওকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে। জ্যোতি—, "কাকা, কই আমার ত কিছু হয়নি। এখন আমি ভালই আছি।"

সুলেখা ঘাট পার হয়ে সোজা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বাসায় গিয়ে হাজির। তিনিও প্রস্তুত হচ্ছেন বেরুবেন বলে। এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে মুখখানা কালো করে ঢুকতে দেখে বল্লেন—, "কি খবর সুলেখা! তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন? যা গ্রীষ্মের গরমেও দেখায় না।" সুলেখা প্রেমলতার ঘরের ফ্যানটা খুলে দিয়ে আস্তে আস্তে বল্ল—, 'বড় দি—, আমার বড় দি ও তার ছোট দেওয়র ষড়যন্ত্র করে বাবাকে কিছু অতিরঞ্জিত করে লিখে বাবাকে দিয়ে অপমান করিয়েছে এবং

বাবাও দিদিদের কথায় কান দিয়ে—আমায় জানিয়ে দিয়েছেন—, "আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নেই।" প্রেমলতা—, "তা আর ভয় কি ? তুমি'ত এখন সাবালিকা ও সাবলম্বী হয়েছে। তবে মনে হয় উনি ভুল বুঝে রাগ করেই বলেছেন। তবে তুমি যদি মনের তরফে প্রস্তুত থাক তবে মনে হয় তোমাদের রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ করে নেওয়াই ভাল, তাতে কারো কিছু বলার থাকে না। কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না।" সুলেখা—, "কিন্তু কে কি করবে····" প্রেমলতা—, "কে কি আবার করবে ? আমরা'ত আছি। মনটাকে চাঙ্গা কর।

চল আগে 'ক্যাম্প্‌টা' সেরে আসি। তার পর সব হবে।" বলেই বল্লেন, "আচ্ছা তুমি খেয়ে এসেছ'ত ! সুলেখা—, "হ্যাঁ—, তবে একটু জল দিতে বলুন বড়দি।" প্রেমলতা তার কাজের মেয়েটাকে এক গ্লাস সরবৎ করে দিতে বল্লেন। সুলেখা সরবৎ খেলে—, সুলেখা ও বড়দিদি মণি একটা রিক্সা করে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সুলেখার ব্রতচারীর আসর বসেছে 'হাওড়া ময়দানে। নানান স্কুলের প্রতিনিধিরা তাঁরা যে যাঁর ক্যাম্পে আগেই চলে এসেছেন। সুলেখা এবং প্রেমলতা তাদের নিয়ে তাদের নির্ধারিত ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হ'ল। যথা সময়ে 'হাওড়া-ময়দানে' তাদের দশদিনের বিভিন্ন দলের ব্রতচারি উৎসব শেষে ঠিক্ হ'ল সকলে মিলে শিবপুর বোটানিক্যাল-গার্ডেন দেখতে যাবেন। সুলেখার স্কুলের মেয়েরাও যাবে ঠিক হ'ল। এগার দিনের দিন—সকল মেয়েরা অন্যান্য অপর স্কুলের দিদিমণিদের সঙ্গে 'শিবপুর-বোটানিক্যাল-গার্ডেন—' দেখতে একটা রিজার্ভ বাসে চলে গেল। সুলেখাও তার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা—প্রেমলতা ও আর এক দিদিমণি শিব-পুর গেলেন না। কারণ—সুলেখা আগের দিন প্রেমলতাকে বলে রেখেছে—আগামী কাল বিশু কাকার সঙ্গে জ্যোতি হাওড়ার ষ্টেশনে এসে থাকবে। এখানেই সে জ্যোতির সঙ্গে রেজেষ্ট্রী-ম্যারেজ সেরে নেবে। এখানকার আর একজন অল্প-বয়স্কা শিক্ষিকাকে সঙ্গে নিয়ে সুলেখা ও

প্রেমলতাদেবী হাওড়া রেল-অনুসন্ধান অফিসের সামনে এসে দেখলেন—জ্যোতি ও বিশুকাকা আগেই এসে হাজির। বিশুকে দেখে সুলেখা বল্ল—, "কাকা তোমরা এসে গিয়েছ! ভালই হ'ল।" বলে বিশু ও জ্যোতিকে সঙ্গে নিয়ে সাব-ওয়ের ভিতর দিয়ে হাওড়া-ষ্টেশনের বাইরে এসে কিছুটা দূরে গিয়ে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ডেকে বল্ল—, "ভাড়া যাবে?" বৃদ্ধ ট্যাক্‌সিওয়ালা উত্তর দিল—, "ক্যাহা জায়েগা—মাইজি।" সুলেখা—, "ম্যারেজ রেজেষ্ট্রী-অফিস্।" ড্রাইভার—, "হাঁ—চলিয়ে।" বলে তার গাড়ীর দরজা খুলে দিল। সুলেখা ও প্রেমলতা দেবী এবং ব্রতচারীর অপর একজন দিদিমণি—সুলতা দেবী পিছনে উঠলেন। আর সামনে ড্রাইভারের পাশে জ্যোতি ও বিশু-মাঝি উঠল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ম্যারেজ-রেজেষ্ট্রী অফিসের সামনে গাড়ী এসে হাজির হ'ল। ড্রাইভার তার মিটার দেখে—ভাড়া মিটিয়ে নিল। তখন বেলা এগারটা। ম্যারেজ-রেজেষ্ট্রী-অফিস সবে খুলেছে। সুলেখা—ও আর আর সকলে—অফিসের মধ্যে গেলে অফিস্ বয় জিজ্ঞাসা করল—, 'আপনারা কি চান?" সুলেখা—. তার—ম্যারেজ-রেজেষ্ট্রীর কথা বল্ল। এতক্ষণে জ্যোতি কোন কথা বলেনি—এবং তাকেও কেউ কোন কথা বলেনি। সে সাহসে ভরকরে—সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করল—. "লেখা—, আমি'ত এখন ভালই আছি; তবে কেন এখানে আমাকে দেখাতে নিয়ে এলে? তুমি না বলেছিলে আমায় দেখাবে?" এতক্ষণে সুলেখ—ও আর আর সকলে হেসে ফেল্লেন। সুলেখা—উত্তর দিল—, "হ্যা, তুমি সুস্থ হ'লেও আমি—সুস্থ নই। তাই তোমাকে আইনের চোখে আমার বিবাহিত স্বামী বলে সকলকে দেখাব বলেই এখানে নিয়ে এলাম। 'প্রেমলতা. 'কেন, উনি জানেন না—এখানে কেন আসা?" বিশু—, "না মা! সুলেখা-মা আমাদের বলেছিল আজ এখানে আসতে। তা আমিই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন মা? মা আমার বলেছিল— "দেখাব বলে।" ভেবেছি—ক'দিন আগে জ্যোতির বড়-জ্বর হয়েছিল কিনা—

তাই আমরা ভেবেছি—ডাক্তার দেখাবে।” আর একবার সকলে হাসা-হাসি করল। হাওড়া-গার্লস্ স্কুলের ব্রতচারীর শিক্ষিকা—সুলতা দেবী বল্লেন—, “যিনি—কিনা আজকের আসরের নায়ক, তিনিই জানেন্ না—কেন এই আসরে আশা! সুলেখা—তুমি'ত খুব চাপ ও সাবধানি মেয়ে—। ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রার বিস্ময়ে সুলেখাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন—, “উনার সঙ্গে কার সঙ্গে বিয়ে হবে ?” সুলেখা—, “আমার সঙ্গে।” ম্যারেজ-রেষ্ট্রারার এক মূহুর্ত্ত চুপ করে থেকে আপন মনে ভাবলেন—'একি পাগলামি ?'' সুলেখার—আপাদ-মস্তক লক্ষ করে বল্লেন—, “আপনি কি করেন ?''

সুলেখা. “আমতা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা। রেজিষ্ট্রারাব—, “প্রাইমারী না হাই ?” সুলেখা—, “হাই।” এবং প্রেমলতাকে দেখিয়ে বল্ল—, “উনিই আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা।” রেজিষ্ট্রারার আবার জ্যোতির দিকে লক্ষ করে বল্লেন—, “মনে হয় উনি চোখে কম দেখেন।” সুলেখা—. “উনি কম দেখেন-না, একেবারেই দেখতে পান না।” রেজিষ্ট্রারার এক বার চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে আপন মনে বল্লেন—, “How strange !” আবার সুলেখার দিকে লক্ষ করে রেজিষ্ট্রারার বল্লেন—, “আচ্ছা, আপনি যদি কিছু····, সুলেখা রেজিষ্ট্রারারের কথায় বাধা দিয়ে উত্তর দিল—, হ্যাঁ—, আমি সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানসিক অবস্থাতেই আছি।” জ্যোতির দিকে তাকিয়ে আবার বল্ল—“উনি আমার বাবার বাল্যবন্ধুর ছেলে, বর্তমানে উনার বাবা-মা কেউ নেই। উনার স্কুল-জীবনে চোখ ওঠে—, চোখে গাছড়া ওষুধ দিয়ে দৃষ্টিটা হারিয়েছেন। তবে গান-বাজনা নিয়েই উনার দিন কাটে। আমি উনাকে আমার স্কুল-জীবন হ'তেই সঙ্গী—বন্ধু ও পরে ভালবেসেছি তাই আজকেও উনাকে সমাজের ও আইনের চোখে আমার সারা-জীবনের জীবন-সঙ্গী করে পেতে এসেছি—আপনাদের সাহায্যে।' রেজিষ্ট্রারার সুলেখার মুখে সব শুনে কি বলবেন ঠিক করতে নাপেরে বলে উঠলেন—, ‘God bless you !” বলেই আফিস

ক্লার্কদের ডেকে বল্লেন—, "উনাদের যা দরকার সব করে লিখে পড়ে ঠিক্‌ঠাক্ করে দিন।" অফিস ক্লার্করা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি ফর্মে সব লিখে এবং পাত্রী পক্ষের দুই দিদিমণির সাক্ষী নিয়ে এবং পাত্র-পক্ষের বিশু মাঝির টিপ সই নিয়ে ফর্ম ম্যারেজরেজিষ্ট্রি ম্যাজিষ্ট্রেটের টেবিলে দিলেন। ম্যাজিসষ্ট্রেট পাত্র-পাত্রী উভয়কে শপথ-বাক্য পাঠ করিয়ে নিয়ে সুলেখার সামনে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন—, নিন্—, সই করুন।" সুলেখা স্থির হয়ে ফর্মে সই করে দিলে ম্যারেজ রেষ্ট্রারার পাত্রের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—, "উনি সই করতে পারেন? বলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেই বল্লেন—, "হ্যাঁ, উনি'ত লেখা-পড়া করতে করতে.... বলেই বল্লেন—,

"নিন্ সই করুণ।" বলে ফর্মটা জ্যোতির দিকে এগিয়ে দিলেন। সুলেখা তার পেনটা এগিয়ে দিতেই ম্যারেজ রেষ্ট্রারার তার পেনটা জ্যোতির হাতে তুলে দিয়ে বল্লেল—, "থাক্, আমার পেনটাই নিন্।" জ্যোতি ম্যারেজ রেষ্ট্রারের হাত হতে পেনটা নিয়ে ফর্মের যে স্থানে সই করতে হবে, সেই স্থানটা একজন ক্লার্ক আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। জ্যোতি ধীরে আস্তে আস্তে সই করে পেনটা আবার রেজিস্ট্রার—ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে ফেরৎ দিতে—উনি বল্লেন—, "পেনটা ফেরৎ দেবেন না।" সুলেখার দিকে তাকিয়ে আবার বল্লেন—, "ধরুণ আপনি আমার ছোট বোন, এটা আমার দেওয়া উপহার।" আবার সুলেখার দিকে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে বললেন—, "উনি'ত বেশ লিখতে পারেন।" সুলেখা—, "হ্যাঁ, গান ও কবিতা লিখে উনি নিজে নিজেই সুর দেন। ম্যাজিস্ট্রেট, "বাঃ বাঃ! সুন্দর! আমার কলম দিয়ে উনি কবিতা লিখবেন। এটা আমার স্মৃতি রইল।" জ্যোতি ও সুলেখা উভয়েই একই সঙ্গে হাত তুলে ম্যাজিস্ট্রেটকে নমস্কার জানাল। ম্যাজিসষ্ট্রেট ও প্রতি নমস্কার জানালেন। অফিসের একজন কেরানী—, "তাহলে আমাদের আজ আনন্দের দিন, একটু মিষ্টি-মুখ হোক্।" সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে একটা

কুড়ি টাকার নোট বার করে দিতে যাচ্ছে তখন ম্যাজিসট্রেট—, "আহা থাক্ থাক্।" অফিসের বড় বাবুর দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন—, "বড় বাবু! আমরা'ত চিরকালই পরের খেয়েই আসছি, আজ না হয়— আমরাই খাওয়াই, বলেই নিজের পকেট হ'তে দুটো দশ টাকার নোট বের করে অফিস্ বেয়ারাকে ডেকে বল্লেল—, "নাও যা ভাল হয় কর।" তখন—হেড্ মিস্ট্রেস—একটা দশ টাকার নোট বার করে বেয়ারার হাতে দিয়ে বল্লেন—, "এটায় চা বিস্কুট আনবে।" অফিস্—বেয়ারা একবার ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকাতে উনি বল্লেন—,

'নাও। এটা না নিলে উনি মনক্ষুণ্ণ হবেন।'' যথারীতি মিষ্টিমুখ ও চা-পর্ব শেষ হলে, সুলেখা—জ্যোতি, ও আর আর সকলে— অফিস্-বাবুদের ও ম্যাজিস্ট্রেটকে নমস্কার জানালে—উনারাও প্রতি নমস্কার জানালেন। ম্যাজিস্ট্রেট আপন মনে বল্লেন—, "আমার জীবনে—একটা সার্থক প্রেম দেখলাম, ঈশ্বর করুন—এই প্রেম-অক্ষয় হোক!'' বাইরে এসে সুলেখা বিশু কাকাকে ডেকে বল্ল-, "কাকা! তুমি বড়দির সঙ্গে চলে যাও। আর বাড়ী-ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কর। আর এই নাও টাকা, রান্নার-হাঁড়ি-কড়াই, বালতি-হাতা, যা-যা দরকার কিনে নিয়ে যাও। আজ হ'তে তোমাদের বাড়ীর বৌ হলাম; তোমাদের বাড়ীতেই উঠব।'' বলেই একটা পঞ্চাশ্ টাকার নোট্ বের করে বিশু-মাঝির হাতে দিল। বিশু অনুগত আজ্ঞা-বাহকের মত হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আর প্রেমলতা ও সুলতা দেবীকে উদ্দেশ্য করে সুলেখা বল্ল—, "বড়দিদি—! আমি একটু কালিঘাটে যাব। মায়ের চরণের সিন্দুর নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরব।'' প্রেমলতা ও সুলতা দেবী সুলেখা-জ্যোতিকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলেন। সুলেখা-ও জ্যোতি একটা ট্যাক্সি ডেকে কালিঘাটের দিকে রওনা দিল। সুলেখা কালিঘাটে গিয়ে একজন ব্রাহ্মণ ডেকে মায়ের চরণে পূজা দিয়ে ও মায়ের চরণে নিবেদন করা সিন্দুর জ্যোতির হাত দিয়ে সুলেখা—

কপালে গ্রহণ করল। এই ভাবেই সুলেখার মাতৃ-চরণ সাক্ষী করে জ্যোতির দেওয়া সিন্দুর তার কপালে নিয়ে তার সিন্দুর দান পর্ব শেষ হ'ল। পরে বাজার হ'তে কিছু কাপড়-জামা কিনে সন্ধ্যার আগেই বেতাই ঘাট পার হয়ে জ্যোতি-সহ জ্যোতির-ঘরের দিকে রওনা দিল। ইতি পূর্বে বিশু মাঝি সুলেখার বেডিং ও সুটকেস্ এবং প্রয়োজনীয়—এটা-সেটা নিয়ে যখন ঘাট পার হয়ে জ্যোতির ঘরে উঠেছিল—তখনও সকলে বিস্ময়ে—চেয়ে দেখেছিল। কেবল শুধু চায়ের দোকানের মালিক—মদন-মালি বলেছিল—, "কি গো দাদা! তোমরও কি কপাল ফিরল?" বিশু-মাঝি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল—, "কখনো—নৌকার উপর গাড়ী, আবার গাড়ীর উপর নৌকাও উঠে। পেটের ছেলের বৌরা'ত ভাত দিল না, দেখি ধর্ম ছেলের বৌতে ভাত-দেয় কিনা!" কোন আকস্মিক ঘটনা—তা যেমন বাতাসের আগেই চলে, তা সে—শুভই হোক্ আর অ-শুভই হোক্; তাই হোল। এবং সেই ভাসা-ভাসা অনুমান ও সন্দেহ সকলের নিরসন হ'ল যখন প্রকাশ্যে সকলে দেখল—গোধূলির আলোতে সুলেখা-জ্যোতির হাত ধরে কপালে টক্ টকে সিন্দুর দিয়ে আস্তে আস্তে জ্যোতির ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ।

পশ্চিমের পরস্ত-সূর্য্যের রক্তিম আভা সুলেখা জ্যোতির মুখেও সর্বাঙ্গে এসে পরেছে তখন মনে হ'চ্ছে আনত স্বলজ্জ-সুন্দর কোন দেবী নব-বধূর রূপে যেন—অন্ধকারের প্রাণহীন যম-পুরী হ'তে প্রাণের স্পন্দনের ছোঁয়া দিয়ে—আলোর পথে নিয়ে চলছে—তার স্বামীকে, তাঁর প্রাণের ছোয়ায়—নব-জীবনে। তাই পথের ধারে যাঁরা দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখতে বেরিয়েছে—দোকান হ'তে বাইরে—, ঘর হ'তে পথে, তাদের মুখে কোন 'রা' নেই। নীরবে চুপ করে কোন মন্তব্য না করে অপার বিস্ময়ে ভাবতে লাগল—, "একি সত্যি না স্বপ্ন? ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।" এদি কে বিশু-মাঝি আগেই বাড়ী এসে বাড়ী ঘর পরিস্কার করে—, বেডিং-পত্তর গুছিয়ে—, নিজেই

বুদ্ধি করে একটু মিষ্টি এনে রেখেছে। জ্যোতি সুলেখাকে আসতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বল্ল—, "আজ যদি তোদের কাকি থাক্'ত, তার কি আনন্দের না—দিন! কেই বা একটু মেয়েলি আচার করে!" আবার একটু দম ধরে বল্ল—, "তাতে কি হয়েছে? আমিই সব করব। তোমরা উঠে বস মা। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি।

সুলেখা হেসে বল্ল তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন কাকা? আজ হ'তে আমিই তোমাদের সব ভার নিলাম। আর এই বাড়ী-ঘর সবই'ত আমার, আমায় দেখতে হবে না?" বিশু গদ্ গদ্ হ'য়ে বল্ল—, "কি আর বলব মা, আমাদের সাত জন্মের পুন্যি তাই তোমার মত লক্ষ্মী হেঁটে এল আমাদের ঘরে! তা তোমরা সুখী হও। ঠাকুর তোমাদের সুখী করুন।"

এদিকে সুলেখার খবর চারি দিকে ছড়িয়ে পরেছে। সুলেখার দিদিরা কেউ মজা মারল, কেউ বা খুশিই হ'ল এই ভেবে, 'বাবা বাদ-বাকি সব-সম্পত্তি ঘর-জামাই করে সুলেখার নামে দেবেন বলেছিলেন—সেটা ত আর হ'ল না; ভালই হ'ল—ষাড়ের শত্রু বাঘে মারল, কেবল সেজ দি ও সেজ জামাই বাবু কোন মন্তব্য করলেন না। সুলেখার বড়-দির ও তার ছোট দেওয়র অরুণের মুখে চুন-কালি পড়ল। পিছনে লেগেও শত্রুতাই করেও কিছু করতে পারল না। এখন কিছু করারও থাকল না। কারণ এরপর কিছু করতে গেলে আইন এখন সুলেখার পক্ষে। সুলেখার মায়ের মন ভীষণ খারাপ। যখন শুনলেন সুলেখা জ্যোতিকে রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ করেছে—তখন তিনি তাঁর স্বামীকেই দোষারোপ করলেন। কিন্তু মণিমোহন বাবু গুম্ হয়ে থাকলেন। কেবল মন্তব্য করলেন—, "লোকের ছেলে-মেয়ে মরে না? আমি তাই ভাবব। ও আমার মেয়ে নয়। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। জীবনে ওর মুখ আর দেখব না।" ইত্যাদি। কিন্তু সুলেখার মা—স্বামীর কথার প্রতিবাদ করে বল্লেন—, তোমার জন্যে এমন হ'ল। যাবার সময় বার বার নিষেধ করলাম—, এখন অমন করে

কিছু বলো না। দশদিনের মত বাড়ীর বাইরে ট্রেনিং-এ যাচ্ছে, বাড়ী ফিরুক। আর তুমি সেকথা কানেও তুললে না ; শোনালে— "যদি আমার অবাধ্য হ'ও তবে আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নেই। তুমি অন্ধের সঙ্গে অন্ধ হয়েছ। আমি তোমায় কোন প্রশ্রয় দেব না।" কত কি। তুমি জান না মেয়ে সাবালক ও বুদ্ধিমান।

সে নিজের যোগ্যতা অর্জ্জন করে উপায় করতে শিখেছে! তাতে জেদী। তাকে বুঝিয়ে মানিয়ে ঘরে তুলতে হবে! তাতে লোকে যা বল্ল তাই শুনলে—তার সত্যতা জানতে চাইলে না। আর ঘর-জামাই'ত করতেই চেয়েছিলে—না হয়—জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দিতে—তাতে তোমার মর্যাদা বাড়'ত বই কম'ত না। যেমন বজ্র-আটুনি দিতে গেলে —তেমন ফস্‌কা গেরো হ'ল। সাত পাল মেয়ের বাবা হয়েছ—জান না—এক একটা রতন? ওর চেয়ে জ্যোতির মত আমার একটা অন্ধ ছেলে থাকলেও সে ভিটেতে থাকত। তোমর উচিত ছিল আগে ঘটনা কত দূর সত্য জানা। তোমার উচিৎ ছিল মেয়ে বাড়ী ফিরলে তাকে বোঝান নয়—, ঐ জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে আনা। তাতে সব-কুল বজায় থাকত। মুখ-হাসত না আব মেয়েও বেরিয়ে যেত না। সাত মেয়ের বাবা আর জান না, মানুষ প্রেমে পড়লে চির কাল—অন্ধই হয়। অভিভাবকের উচিত অ-পাত্র ও অ-জাতে যাতে না পড়ে দেখা। তারপর তাদের কপাল, কাউকে দুষতে পারবে না। সেজ মেয়েকে কি আটকে রাখতে পারতে? যদি বিয়ে না দিতে তবে ও-ও পালাত। নয়—যেখানে জোর করে বিয়ে দিতে—, সেখানে ঘর-করতে পারত না। হয়-মরত, নয়—দেহটাকে ভাড়া খাটিয়ে সেখানে নিজের পেটের ভাত রোজগার করত—আব তিলে তিলে মরত। তাই আমিই জোর করে তরুণের হাতে মনলেখাকে তুলে দিয়েছিলাম—,অন্ততঃ সে সুখী হোক্। আর যদি সুখী না হ'ত তবে দুনিয়ায় আর কাউকে সে দোষারোপ করতে পারত না। আজ তারা কত সুখি। তোমার মেয়ের নানান গুণ

যথেষ্ট আছে। সে বুদ্ধি-মতী ও জেদী। তার অভিমান ও মর্য্যাদা-বোধ আর সকলের চাইতে বেশী। আর সে মর্য্যাদা বোধ ও জেদের জন্য তুমিই গর্ববোধ করতে—, আর আজ তুমিই তাকে জেদের মুখে ঠেলে দিলে।

তোমার মনে হল না—তোমার শোনা কথায় এইভাবে নিষ্ঠুর হয়ে কতৃত্বের জেদ দেখানোর পরিণাম কি হ'তে পারে।" মণিমোহন স্ত্রীকে অনুনয়ের সুরে বল্লেন—, "দোহাই তোমায়, একটু চুপ কর। আর সহ্য হচ্ছে না। আমি কি তাকে ভালবাসি নি? আমি পিতা গৃহস্বামী, আমি পুরুষ। আমি এত ভাবতে পারিনি! আমার সব অহংকার চূর্ণ হল। এই সময়ে তোমার এই নিষ্ঠুর নিতী উপদেশ আমায় পুড়িয়ে ছারখার করছে। আমাকে আমার পুরুষালি অহংবোধের অহংকার নিয়ে থাকতে দাও। তা যতই ভুল হোক—তবুও তার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে একটু নরম থাকতে পারব, একটু সান্ত্বনা পাব। আমি যা করেছি ঠিক করেছি। এখন যা হবার হবে, এই ভাগ্য।"—বলে চোখের জল ঢাকতে বাড়ীর বার হয়ে বার বাড়ীতে যেতে যেতে আবার বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন—, "আমি ভেবে উঠতে পারিনি,—বড়-মেয়ে-জামাই কুটুম; কুটুম চটাব না। আবার ভাবলাম—ছোট-মেয়ের-বিয়ে হয়নি—, তাকে যদিও বা শাষণ করা চলে—তবুও কুটুম-বিচ্ছেদ উচিৎ নয় —"

সুলেখার মা-বাবা যতই আহত বা দুঃখ পান না কেন—এটা তাঁদের পাওনাই ধরে নিতে হবে। আমাদের তাঁদের দিকে নজর দেবার সময় নেই। চলুন সুলেখা তার অন্ধ স্বামীকে নিয়ে কেমন করে সংসার করছে দেখি।

উচ্চ-শিক্ষিতা সুলেখা, উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রীয়ও বটে, তবুও শিক্ষার-অভিমান ও রূপ কোন দিন তার অন্ধ-স্বামীকে অশ্রদ্ধা করেনি। বরঞ্চ নিঃস্ব নিঃপর বিশু মাঝিকে সুলেখা ঘাটের হাল ছাড়িয়েছে। বিশু-মাঝি ঘাটের হাল ছাড়তে চাইনি। কিন্তু সুলেখা

বিশুকে যুক্তি দেখিয়েছে—, "কাকা এত দিন আমি ছিলাম না, তাই হাল ধরতে হয়েছে—, কে তোমার ছেলেকে খাওয়াবে দেখবে? তুমি কি খাবে? কিন্তু আজ আমি এসেছি, আমি যা উপায় করি আমাদের তিন জনের বেশ চলে যাবে। তার পরও তোমাদের খাটাব আর দুটো ভাত দেব? লোকে কি বলবে?

আমার বিবেক কি বলবে?....তা হবে না। তুমি আমার বাড়ীর অভিভাবক। বাজার-হাট, কেনা-কাটা, দেখা-শুনা, সব-তোমার ভার। তুমিই আমাদের দেখবে। আমি কি তোমার ছেলের বৌ নই? দুটো ভাতের জন্যে এই বয়সেও তোমায় খাটতে হবে? তা হতে পারে না, আমি যা বলব তাই হবে।" বিশু সুলেখার কথার কোন উত্তর দিতে না পেরে—তার চোখ-দুটো জলে ছল ছল করে উঠল—, আর মনে পড়ল—তার নিজের ছেলেদের ও তাদের বৌদের ব্যবহার এবং স্ত্রীর কথা, নিরবে সুলেখার আদেশ মাথায় নিয়ে শুধু বল্ল—, "তোরাই আমার ছেলে মেয়ে মা! পেটে ধরলেই কি আপন হয়? ভগবান মুখ তুলে চাক—তোমাদের জয় হোক।"

সুলেখা, জ্যাতিকে বিবাহ করায়—নানান-জনের নানান মন্তব্য। যিনি যেমন তিনি তেমন মন্তব্য করলেন। কেউ বল্ল—, "জ্যোতির কপাল কি? পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল। একেই বলে স্ত্রীভাগ্য, ভাগ্যবান বটে; তা ভগবান ওদের মঙ্গল করুণ, কেউ বল্ল—, "আরে ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! মানুষ প্রেমে পড়লে কি এমনই হয়! অমন সুন্দর মেয়ে, তাতে লেখা-পড়া জানিস—, আবার মাষ্টারী করিস, তোর কি ছেলের অভাব হ'ত? কোথায় মলি— কানা গর্তে! দেখ্, প্রেম দুদিনেই কেমন করে জানালা দিয়ে পালায়—ইতাদি-ইত্যাদি।" আবার কেহ মন্তব্য করল—, "ধন্য মেয়ে! একেই বলে সত্যিকার শিক্ষা। আর এরই নাম নারী প্রগতি! পুরুষ যদি মানাতে পারে তবে নারী কেন পুরুষের পাশে দাড়িয়ে আদর্শে, ত্যাগে-মহত্বতায় সমান হবে না? যদিও একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' গল্পের নায়ক 'শিশির' একটি অন্ধ

মেয়ে 'রজনীকে' বিবাহ করেছিলেন; তা-ছাড়া অন্ধের হাত-ধরা—নারীর ঘটনা বিরল। তাই সুলেখা আজ সর্বকালের নারী সমাজের গর্ব, আদর্শ, ও অনুপ্রেরণা। ধন্য নারী সমাজ। আজ যত রূপ-বিদ্যা-অর্থ সর্বস্ব-অহংকারী নির্বোধ-স্বার্থপর নারী আছে—, তাদের চোখ-খুলুক—; চেতনার উন্মেষ হোক। তাদের হৃদয়ে সত্যিকারের প্রেমের সঞ্চার হোক।....ইত্যাদি।"

সুলেখার কোন মন্তব্যেই কিছু যায় আসে না। সে তার আদর্শের পথেই চলবে। ইতি মধ্যে কিছু স্কুল-শিখিকা—, যাঁরা সুলেখাকে সমর্থন করেন তাঁরা একদিন দিন ঠিক করলেন সুলেখার বিবাহের স্বীকৃতি স্বরূপ একদিন জ্যোতিকে—অভিনন্দন জানাতে যাবেন। স্থির হ'ল—এই মাসের ফাল্গুনী-পূর্ণিমার দিনই তারা সুলেখার বাড়ী যাবেন। সুলেখা-জ্যোতিকে আবীর দিয়ে জানাবেন—তাদের স্বীকৃতি ও আনন্দ এবং জ্যোতির গান শুনবেন। দেখতে দেখতে দোল-পূর্ণিমা এল, সুলেখার স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা ও আর পাঁচ-জন শিক্ষিকা সুলেখার জন্য উপহার ও ফুল-আবীর নিয়ে সুলেখার বাড়ী এল। সুলেখাও তৈরী ছিল। বাড়ী-ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে আগের গানের আসরের এক জন তবলচীকে ডেকে পাঠিয়ে আগে হ'তেই বাড়ীতে আনিয়ে রেখেছে। স্কুলের দিদি-মনিরা সকাল ন'টার মধ্যে এসে হাজির হলেন, বিশু কাকা তাদের আপ্যায়ণ করল—, "আসুন মা, আসুন আপনারা।" সুলেখাও দ্রুত বেরিয়ে এসে আন্তরিক আহ্বান জানাল—, "আসুন-বড়দি, আসুন দিদিরা" কেবল জ্যোতির উপায় ছিল না, সে তক্তাপোশের এক পাশে চুপ করে বসে ছিল। দিদিমণিরা ঘরে উঠে এসে জ্যোতিকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন—, "আপনাকে আমরা আবীর দিতে এলাম।" জ্যোতি হাত জোড় করে দিদিমনিদের উদ্দেশে বল্ল—, "আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার।" দিদিমণিরাও সকলে—, 'নমস্কার' জানালেন। বড়-দি—, তবলজীকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা

করলেন—, 'উনি কে ?" "উনি আমাদের তবলার ওস্তাদ" শ্রীসুশিল ভট্টাচার্য" বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সুশিল বাবুও—সকলকে—'নমস্কার" জানালেন। দিদি-মণিরাও প্রতি 'নমস্কার—' জানালেন। সুলেখা—, "দিদি আগে একটু-চা-হোক।" বড়-দিদি মণি—, "আগে আমরা যাঁর জন্য এসেছি তাঁর, এই ফুলগুলো নাও, আর এসো আবির নাও।" সুলেখা উপহারগুলো নিল, আর জ্যোতি—ফুলগুলো নিল। সুলেখা আগে বড়-দিদিমণির পায়ে আবীর দিতে গেলে, বড় দিদি-মণি সুলেখার হাত চেপে ধরে বল্লেন—, "আজ পায়ে নয়, এসো—তোমার কপালটা আজ আবীরে রাঙিয়ে দিই।" সুলেখা—মাথা নিচু করলে সকলে একে একে সুলেখার মুখটা আবিরে রাঙিয়ে দিল। সুলেখাও সকলকে—আবীর দিল। দিদি মণিরা আবীর নিয়ে জ্যোতির কপালে একটা করে আবীরের ফোঁটা দিলেন। জ্যোতিও সকলের কপালে একটা করে—আবীরের ফোঁটা দিল। তবলজী ও বিশুকাকা ও পরস্পরকে আবীর দিল। সুলেখা ও বিশু—মিষ্টির প্লেট এনে সকলকে পরিবেশন করল। দিদিমণিরা—সুলেখাকেও ডাকলে—সুলেখা উত্তর দিল—, "আসি দিদি—, এই চা-টা নিয়েই আসচি!" খানিক বাদে চায়ের ট্রেতে চায়ের টি-পটে চা-ভর্তি করে চায়ের কাপ-ডিস্ গুলো সাজিয়ে সকলের সামনে টেবিলে রাখতে—বিশু বল্ল—, "মা! তোমরা—মিষ্টি মুখে দাও, আমি পরে চা ঢেলে দেব।" বড়-দিদিমণি—, "না, আপনিও নিন।" সুলেখা—, "কাকা! তুমিও নাও। আমরা হাত-ধুয়ে চা-ঢেলে নেব।" মিষ্টি-মুখের পর চা-পর্ব শেষ করে—সকলে অনুরোধ করলেন, "আজ আমরা আপনার গান শুনতে এসেছি— জ্যোতি বাবু!" জ্যোতি—, "বেশ! আমার গুরু মারা যাবার পর আর'ত ভাল গুরু পাইনি, তা সা-পরি নিশ্চয় শোনাব।" সুশিল বাবুকে উদ্দেশ্য করে জ্যোতি বল্ল—, "বাঁয়া বাধুন দাদা!" সুশীলবাবু হাতুড়ী দিয়ে—ঠুাং-ঠ্যাং করে তবলায় ঘা দিয়ে বাঁয়া বেধে নিলেন।

সুলেখাকে জ্যোতি বল্ল—"তুমি তানপুরা—।" সুলেখা—হেসে বল্ল—, "আচ্ছা তুমি ধর!" জ্যোতি গান ধরল—,

মধু রাতে শুনি কেন····বাঁশরীর ধ্বনী!
ওগো শ্যাম····আর বাঁজাওনা বাঁশরী ····.ই।
মন যদি মানে কভু—, মানে নাত নয়নের মণি—,
বারে বারে শুনি কেন বাঁশরীর ধ্বনি ···· ই।
আমি না দেখিয়া হই শ্যাম দিশা হারা—,
শাশুড়ী-ননদী ঘরে দেয় পাহারা — আ।
কি করি হায়! কি না করি ভেবে না পাই,
ওগো! জল-ফেলিয়া জল আনিতে যাই।
আর বাঁজাইও না — শ্যাম বাঁশরী — ই,
তোমার দুটি পায়ে ধরি, আর বাজাইওনা বাঁশরী — ই।
মধু রাতে জল আনিতে খুঁজে মরি শ্যাম তোমারে —ই—,
ওগো-শ্যাম! নিশি-রাতে কেন শুনি বাঁশরীর—ধ্বনি।

গান শুনে সকলে খুশি। দিদি-মণিরা আর একটি গানের অনুরোধ জানালেন। জ্যোতি আর একটি গান ধরল—,

হোলিরে আজি হোলিরে।
ওরে-আজো তামালের বনে, কুঞ্জে-কাননে-তোলে আলোড়ন,
কোথা রাধা-প্রিয়া, ওরে কোথা গেলে পাব ব্রজের কৃষ্ণ ধন!
ওগো-প্রকৃতির মাঝে-মিশে আছে আজো রাধ-কৃষ্ণ ধন!
আজি বিরহ-পরাণে-ফাগুনের-গানে-রাঙ্গাল সবার মন।
আজি — হোলিরে — আজি হোলিরে!
আবিরে-আবিরে ভরে গ্যাছে আজি পলাশ-শিউলের মন—,
ও কালো ভ্রমর! ফুলে ফুলে আজি করো কেন গুঞ্জরণ।
ঝিরি ঝিরি দক্ষিণা বায়ে সুরোভিত আজি আম্র কানন্—,
ও কালো কোকিল! সাথীহারা কুহু-তানে কেন হও আনমন!
আজি — হোলিরে — আজি — হোলিরে।

গান শুনে সকলে খুশি। দেখতে দেখতে প্রায় বেলা এগারোটা বেজে গেল। দিদি-মণিরা বল্লেন—, "এবার উঠি—সুলেখা, বেলা'ত অনেক হ'ল! আমরা খুব আনন্দ পেলাম।" সুলেখা—, আজ এবেলা আমার এখানে খাওয়া-দাওয়া করলে হ'ত না-দিদি!" বড়-দিদিমণি—, "খাওয়া'ত হয়েই গিয়েছে! যা খাইয়েছ! এবেলা না খেলেও চলবে! তা—বাড়ী-ঘর'ত আছে, বেশ আনন্দ হ'ল—। তোমরা সুখী হও। আবার আসব —।" বলে সকলে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

সুলেখার দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল। জ্যোতি আর বাইরে বসে না। ঘরে বসেই গান-বাজনা করে। সুলেখার চাকুরী জীবনের দু-বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল। ঠিক্ হ'ল সুলেখা বি, টি, পড়তে যাবে। সুলেখা ভাবল—, "আমি বি, টি, পড়তে গেলে—জ্যোতি একা-একা কি করবে? বরঞ্চ একজন ভাল ওস্তাদ রেখে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শেখাই, তাতে ওর সময়'ও কাটবে—আর সঙ্গীতের মানও বাড়বে।" এবং করলোও তাই। সুলেখা হাওড়া—বি, টি, পড়তে গেল—এবং জ্যোতির জন্য এক জন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের ভাল ওস্তাদ নিয়োগ করল। বিশু-মাঝিই রাধে-বাড়ে, দেয়-থোয়, এবং সব-দেখা শুনা করে। সুলেখা ছুটি পেলেই মাঝে মধ্যে আসে যায়—দেখা শোনা করে। এইভাবে সুলেখার বি, টি, পড়া দেখতে দেখতে এক বৎসর হয়ে গেল। সুলেখা বি, টি, পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এল, এবং তার—সংসারের হাল—আবার সেই ধরল। জ্যোতির—সঙ্গীত শিক্ষা আরো এক বৎসর চল্ল। জ্যোতি এখন এখানে ওখানে নিমন্ত্রিত হয়ে—গানেব আসরে গান শোনায়। সুলেখা সঙ্গে যায়—এবং যেখানে যায়, তাঁরাই গাড়ী করে নিয়ে যায় আবার পৌঁছে দেয়। গানের—আসরে জ্যোতির—সু-গায়ক বলে সু-নাম সর্বত্র। তাই যেখানেই এখন বড় জলসা বসে, সেখানেই এখন সুলেখা-জ্যোতি নিমন্ত্রিণ অবশ্যই হয়।

এদিকে সুলেখার বড়-দি জেদ্-দেখিয়ে ছোট-দেওয়রের একটি সুন্দরী ও মাধ্যমিক পাশ— ধনী-ঘরের মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়েছে। ডোমজুরে—একটা বড়-ধরনের গানের জলসার ঠিক্ হ'ল। বাইরের বড় বড় গায়করা অনেকেই আসবেন এবং বড়-ধরনের টিকিটেরও ব্যবস্থা হ'ল। যিনি-যেমন তিনি তেমন মানের—আমন্ত্রণ-লিপি সংগ্রহ করলেন। চন্দ্রলেখা ও তার আর আর বোনেরা এবং চন্দ্রলেখার ছোট-দেওয়র ও তার নব-বিবাহিতা বধূ মিনতীকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা লক্ষ করল প্রথম শ্রেণীর প্রথম—সারিতেই সুলেখা-জ্যোতি পাশাপাশি বসে। সুলেখার দিদিরা ও ছোট-দেওয়র অরুণ হাসা-হাসি করতে লাগল—, "সখ-দেখনা!" আবার টিট্কারী করতে লাগল—, "কানাছেলের নাম—পদ্মলোচন! এটা কি—কেষ্ট যাত্রার আসর—যে এখানে এসেচে? সুলেখা—সবই শুনতে পাচ্ছে—, তবুও কোন দিকে না তাকিয়ে—স্থির হয়ে বসে আছে। এমন সময় ষ্টেজে আসরের পরিচালক—ঘোষণা করলেন—, "আমাদের আজকের সঙ্গীত আসরের উদ্‌বোধনী সঙ্গীত পরিবেশণ করবেন—আমাদের স্থানীয় দৃষ্টিহীন গায়ক শ্রীজ্যোতি সামন্ত।" অরুণ—ব্যাঙের হাসি হেসে মন্তব্য করল—, "প্রেমমেই কাঁনা কেষ্ট!" বোনে-বোনে সব হাসির গুঞ্জন উঠল। আসর-পরিচালক—বল্লেন—, "এটা অসভ্যতার স্থান নয়। এখানে অনেক সুধী ও গুণীজনের সমাবেশ হয়েছে। যদি ভাল না লাগে'ত বেরিয়ে যান।" অরুণের নব-বধূ লজ্জায়-সংকচে শুধু মন্তব্য করল—, "মানুষকে মর্য্যাদা দিলেই তবে মর্য্যাদা পাওয়া যায়।" সুলেখা—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে—নিঃসঙ্কোচে জ্যোতির হাতধরে আসরে নিয়ে গিয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসিয়ে একটু দূরে নিজে বসল। মাইক-ম্যান-মাইক্রোফোন ঠিক্ করে দিল। তবলজী তবলায় ঘা দিল। জ্যোতি—হারমোনিয়ামে বেলো করে গান ধরল—,

ভগবানের আশিবাদে এই আসরে গাইতে আসা—,

আমার এ-প্রাণ ধন্য হবে, আপনাদেরই ভালবাসা।
এই পৃথিবীর এত আলো; সবাই দেখে নয়ন মেলে—,
শুধুই আমি নীরব হয়ে পড়ে থাকি—আঁধার ঘরে।
যেদিন আমি মায়ের কোলে—
জন্ম-নিলাম উষার কালে—,
কুহু কুহু কোকিল ডাকে—শাখায় শাখায় ডালে ডালে—,
প্রথম আলো দেখেছিলাম—ভাগ্যদেবী মায়ের কোলে।
এখন অন্ধকারের মাঝে দেখি—
এই দুনিয়ার কাঁদা-হাসা।
আপনাদেরই ভালবাসায় .... এই আসরে গাইতে আসা।

গান শেষ হ'তে শ্রোতা-বৃন্দ সকলে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। জ্যোতি উঠে নমস্কার করে উঠে আসছে। শ্রোতাবৃন্দ—, "আর একটা হোক—, আর একটা হোক।" "জ্যোতি বাবু! আর একটা—গান শোনান। যদিও আপনার শরীর—ভাল নয়—, তবুও এত অনুরোধ!" জ্যোতি আবার হারামানিয়মের সামনে বসে বেলো করতে করতে গান ধরল—,

ও-দয়াল! আলো দাও.... মোরে আলো দাও!
আঁধারের মাঝে তুমি আলো দাও, আলো দাও!
সুখে-দুখে, মান-অপমানে, যা পেয়েছি আমি,
সে যে ব্যথার বাঁশরী—, তারে বাজিতে দাও—!
ওগো তারে স্ব-করুণ সুরে.... বাজিতে দাও!
সে যে ব্যথায় ভরা.... মোর মধুনিশি যামি—,
হৃদয় ভরিয়া তারে রাখিতে দাও, রাখিতে দাও!
ও-দয়াল আঁধারের মাঝে আলো দাও, আলো দাও!

এবারেও শ্রোতারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হাত-তালি দিয়ে—অভিনন্দন জানিয়ে আবার আনুরোধ জানাল—, "আর একটা হোক!" এবার আসরের পরিচালক উঠে নিজেই বল্লেন—, "উনার শরীরটা ভাল নয়—,

আমাদের একান্ত অনুরোধে গান শোনাতে এসেছেন, আজ এখানে থাক, আবার উনার গান পরে শুনবেন।” জ্যোতি নমস্কার জানিয়ে উঠলে সুলেখা তার হাত ধরে আস্তে আস্তে নামিয়ে আর অপেক্ষা না করে—সঙ্গীত পরিচালক কর্ত্তৃপক্ষকে বলে একটা গাড়ী করে সোজা তার বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

বাড়ী এসে সুলেখার মনে একটা খটকা লাগল, “এত করলাম, কিন্তু জ্যোতির মনের ব্যথা ঘোচাতে পারলাম না ? জ্যোতির প্রতিটা গানের আড়ালে একটাই সুর—সে আলো পেতে চায়। যে আলোয় মানুষ এই ভুবন-মোহিনীরূপে মুগ্ধ হয়ে আছে ; সেই আলোয় সে আমাকে পেতে চায়—, আমাকে—দেখতে চায়। তাই অন্ধকারের মাঝে শুধু আলোর শিখা খোঁজে।” হঠাৎ—সুলেখার মনে হ'ল—, “তাই ত আজকের এই বিংশতিকালের আধুনিক যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রের কত উন্নতি হয়েছে ! লোকের মাথায় অপারেশন হচ্ছে, হার্ট-অপারেশন হচ্ছে, পেট অপারেশন, আর-চোখ ? চোখও ত অপারেশন হচ্ছে ! দেখাই-যাক না কি হয় ?” মনে মনে ঠিক করল সে স্কুলে এক-মাসের মেডিকেল-লিভ নিয়ে মেডিকেল কলেজে যাবে—জ্যোতির চোখের চিকিৎসার জন্যে, কত দূর কি-হয় দেখা যাক না !

পরদিন সুলেখা স্কুলে গেলে সকলের মুখেই জ্যোতির প্রশংসা, এমন সুন্দর-গলা, এত মিষ্টি সুর !” গেমস্—টিচার বেলা ধর, তিনি—ডোমজুর হ'তে রোজ আসেন, তিনি—জ্যোতির গান টেপ্ করে এনেছে। অন্যান্য দিদিমণিরা জিজ্ঞাসা করলেন—, “বেলাদি—তুমি কি করে জ্যোতি বাবুর গান টেপ্—করলে ?” বেলাদি—, “আমার দাদা টেপ্ করে নিয়েছে, আমি আজ স্কুলে আপনাদের শোনাবার জন্যে নিয়ে এলাম।” হেড্-মিস্ট্রেস্ জিজ্ঞাসা করলেন—, “তোমার মুখ ভার কেন—সুলেখা ! তোমার কি হ'ল ?” সুলেখা—, “আমি এক মাসের মেডিকেল লিভ্ নেব বড়দি !” হেড্-মিস্ট্রেস্—, “কেন ? তোমার আবার কি হ'ল ?” সুলেখা—,

"আমার নয়—, আমার স্বামীর।" হেড্-মিস্ট্রেস্ ও আর সকলে ব্যাগ্র হয়ে একই সঙ্গে—জিজ্ঞাসা করলেন—, "কেন! উনার আবার কি হল?" সুলেখা—, "এমন কিছু নয়, তবে উনার চোখটা'ত জন্মান্ধ নয়—, চোখ-উঠে-অন্ধ। কাজেই মেডিকেল-কলেজে দেখাব। কতদূর কি-হয়। ইতি পূর্বে'ত কেউ দেখায়নি—" হেড-মিস্ট্রেস্—, 'সে'ত ভাল কথা! তা তার জন্যে মেডিকেল-লিভ্ কেন নেবে? সামনে পূজোর ছুটীতে যাও। টানা একমাস ছুটী পাবে। আর তার উপর আরো কিছু দরকার লাগে আমি আছি'ত! পূজার কটা দিন বাদ দিয়ে একটা দিন ঠিক্ করে যাও। সেটা'ই ভাল হবে। খামাকা আবার ছুটী নিতে যাবে কেন?" সুলেখা—কথাটা মেনে নিল, "তাই হবে।" তবে সুলেখা বল্ল—, "তাহলে তার আগে একদিন কলকাতায় গিয়ে চোখটা একজন চক্ষু-বিশেষজ্ঞের-দ্বারা ভাল করে দেখিয়ে আনি।" হেড্-মিস্ট্রেস্—, "তা তুমি যাও না কেন! কবে যাবে বল।" সুলেখা—, 'আগামীকাল।" হেড্-মিস্ট্রেস্—, "আগামীকালই! তা যাও। রবিবার বন্ধ থাকে। তবে তুমি একটা ক্যাজুয়াল লিভের পিটিশান্ দাও।" সুলেখা—একটা ক্যাজুয়াল লিভের পিটিশান দিয়ে তার ক্লাস নিতে গেল। স্কুল শেষে সুলেখা—বাড়ী গিয়ে বিশু কাকাকে বল্ল—, "কাকা! আগামীকাল সকালে ফার্ষ্ট বাসে কলকাতায় যাব।" বিশু—, "হঠাৎ কলকাতায় কেন মা!" সুলেখা—, "তোমার ছেলের চোখ দেখাতে। জ্যোতি শুনে উত্তর দিল—, "সেকি? আমার চোখ দেখিয়ে আর কি হবে?" সুলেখা—, "কি হবে না হবে সে আমি বুঝব। তোমার সঙ্গে যাবার কথা সঙ্গে যাবে।" জ্যোতি জানে কোন প্রতিবাদ করে ফল হবে না—তাই চুপ করে ভাবল—, "দেখাক্—, ওর সাধ মেটাক; আমার চোখ'ত আর নেই! বল্লেও যখন শুনবে না অযথা কিছু অর্থ নষ্ট।" পরদিন ভোরে বিশু সুলেখা জ্যোতিকে ঘাট পার করে আমতা হাওড়া মিনিবাসে তুলে

দিয়ে এল। সুলেখা সোজা কলকাতা মেডিকেল-কলেজের চক্ষু বিভাগের চক্ষু-বিশেষজ্ঞের নিজস্ব চেম্বারে গিয়ে ভাল করে জ্যোতিকে দেখাল। চোখ দেখে ডাঃ রায় বল্লেন—, "কোন আশা নেই। চোখ ভাল আছে তবে চোখের cornea অর্থাৎ স্বচ্ছ মণিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানে leucoma অর্থাৎ সাদা হয়ে গিয়েছে।" শুনে সুলেখার—মনটা ছোট হয়ে গেল। সুলেখা জ্যোতিকে বাইরের বসবার ঘরে বসিয়ে ডাঃ রায়কে আবার অনুরোধ করতে গেল—, "ডাক্তার বাবু কোন উপায় নেই? ডাঃ রায়— একটু চিন্তা করে বল্লেন—, "আছে তবে তা হওয়া মুস্কিল।" সুলেখা—, "কেন? ডাক্তর বাবু!" ডাঃ রায়—, "আই-ব্যাঙ্কে আপনাকে আবেদন করতে হবে, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চোখ দান করেন, সেই চোখ অর্থাৎ তার cornea উনার চোখে সেট্ করা যাবে, নতুবা নয়। তাকে অর্থাৎ এই oparation কে cornea-grafting বলে। তবে সেত সুদূর-পরাহত। কারণ কত দিনে কে অথবা আপনার কোন আত্মীয় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চোখ-দান করবেন—আর তা উনার চোখে সেট্ করতে কত কাল কাটবে তার ঠিক্ নেই।" সুলেখা সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে আবার জিজ্ঞাসা করল, "আর কোন উপায় নেই ডাক্তার বাবু!" ডাঃ রায় একটু বিস্ময়ে সুলেখার মুখ-পানে চেয়ে উত্তর দিলেন—, "আর'ত কোন উপায় নেই! এছাড়া'ত আর কোন পথ আজও আবিষ্কার হয়নি।" সুলেখা—, "ডাক্তার বাবু আমি একটা কথা বলছিলাম।" ডাক্তারবাবু আরো বিস্ময়ে বল্লেন—, "আপনি আবার কি পথ আবিষ্কার করলেন।" সুলেখা—, "আমি বলছিলাম কি কোন জীবিত লোকের কোন চোখ তুলে দেওয়া যায় না?" ডাঃ রায় শুনেই চমকে উঠলেন—, "কি-সর্বনাশ—! আপনি আবার কার চোখ তুলবেন?" সুলেখা—, "ভয় নেই অন্য কারো নয়, আমার চোখ।" ডাঃ রায়—চোখ দুটো ছানাবড়া করে বল্লেন—, 'সেকি—

কথা ! সেকি—কেউ পারে ?" সুলেখা—স্থির-কণ্ঠে উত্তর দিল—,, "ডাক্তার বাবু ! আমি কোন চমক, লাগাতে আসিনি—, আমার স্বামীর চোখ পেতে এসেছি, অন্ততঃ একটা চোখও তাঁর চাইই। আমার দু-দুটো ভাল-চোখ দিয়ে এই দুনিয়ার এত আলো দেখব—, আর একটা চোখও তাঁর থাকবে না ? আমার দুটো চোখের মধ্যে একটা চোখ তাঁকে দেব। আমায় অজ্ঞান করে নেবেন।" ডঃ রায়—, "অজ্ঞান'ত অবশ্যই করতে হবে, তবে এমন দান'ত আজো কেউ করে নি।" সুলেখা—, "কেউ করেনি বলে আমিও করব না এমন কি কথা আছে ? আপনাদের ভয় নেই, আমি তার আগেই লিখিতভাবে উইল করে দেব—আমার দুটি চোখের মধ্যে একটি চোখ আমার স্বামীকে স্বেচ্ছায় দান করিলাম।,, ডাঃ রায়—, "হয় বটে তবে আমার আর আর সব সহকর্মী ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তবে আপনাকে জানাব।" সুলেখা—ডাঃ রায়কে নস্কার করে পুনরার অনুরোধ করল—, "আপনারা আন্তরীকভাবে চেষ্টা করুন। আমি আপনাদের কাছে চির-ঋণী থাকব।" তখন ডাঃ রায় বল্লেন—, "আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাব। আপনি আপনার ঠিকানাটা দিন।" সুলেখা তার ঠিকানা ডাক্তারের ডাইরীতে লিখে দিল। সুলেখা বেরিয়ে এলে জ্যোতি জিজ্ঞাসা করল—, "কি হ'ল লেখা !" সুলেখা , "এখন'ত হ'লনা, পরে আবার আসতে বল্লেন। চল আমরা বাড়ী যাই।" সুলেখা জ্যোতি কোলকাতা হ'তে তাদের বাড়ী ফিরল।

সুলেখা পরের দিন স্কুলে গেলে তার হেড্-মিস্ট্রেস্ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—, "কত দূর কি হল সুলেখা !" সুলেখা—, "দেখিয়ে এলাম মাত্র মেডিকেল-কলেজের চক্ষু-বিভাগের প্রধান এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ রায় আবার যেতে বলেছেন—। দেখি ঠিকানা দিয়ে এলাম—, উনি চিঠি দিয়ে জানাবেন বলেছেন—" হেড-মিসট্রেস—, "বেশ ! শুনে খুশি হলাম, নিশ্চয় উনার চোখ চিকিৎসা

করলে ভাল হবে—তাই ডাঃ রায় চিঠি দেবেন বলে জানিয়েছেন। ঈশ্বর করুন তাই হোক। তা তুমি আর চিন্তা করো না। মনে হয় তোমার স্বামী চোখ পাবেন।" সুলেখা আর কোন কথা না ভেঙ্গে চুপ করে তার ক্লাস নিতে চলে গেল। এই ভাবেই সুলেখার গতানুগতিক দিনগুলো কাটতে লাগল। এবং পূজোর ছুটিও হয়ে গেল। সুলেখা অধীর হয়ে আছে কেন ডাঃ রায় তাকে চিঠি দিয়ে জানালেন না—, অথচ ঠিকানা নিলেন। এমন সময় কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার পরদিন হঠাৎ একটি চিঠি সুলেখার নামে এল। সুলেখা চিঠিটা উল্টে-পাল্টে দেখল—কোথা হ'তে চিঠিটা এল। দেখল ডাঃ রায় কলকাতা হ'তে চিঠিটা পাঠিয়েছেন। অধীর আগ্রহে সুলেখা খুলে দেখল—তাকেই ডাঃ রায় সম্বোধন করে লিখেছেন—,

Mrs. Sulekha Debi,

I have consulted with my fellow Dr's. And we are ready for your husband's Eye-Cornea-Grafting oparation. So come with your husband immediatly.

Thanking you.
Yours faithfully.
Dr. Roy. (Eye-Specialist).

সুলেখা— চিঠিটা পড়েই দু-হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বল্ল—, "মা! মুখ তুলে চেয়ো, আমার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়।" বিশু জিজ্ঞাসা করল—, কি হ'ল মা!" সুলেখা—, "কাকা! আগামী দিনই আমরা পনেরো দিনের জন্য কলকাতায় যাচ্ছি। এই দেখ ডাঃ রায় চিঠি দিয়েছেন—তোমার ছেলের চোখ হবে।" বিশু ব্যাগ্রভাবে—, "তাই নাকি মা! আহাঃ তাই হোক্, তাই হোক্। জ্যোতির আমার কত দুঃখ। ঈশ্বর তাই করুন।" বলেই বল্ল—, "আমি একটা বেডিং বাঁধি!" সুলেখা—একটু হেসে উত্তর দিল—, "না কাকা, ওখানেই বেডিং সব পাব। তুমি বাড়ী-ঘর সামলিও, আর আমি একটা কাপড়-জামার সুটকেস্ গোছাচ্ছি;

তাহলেই হবে।" সুলেখা—তার ও জ্যোতির প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় এবং সাম্ভাব্য যতটা পারল টাকা সঙ্গে নিল। পরদিন সকালেই সুলেখা আমতা হ'তে রওনা দিল, এবং বিশু-জ্যোতি-সুলেখাকে বাসে তুলে দিয়ে "জয় দুর্গা, জয় দুর্গা" করতে করতে বাড়ী ফিরল। সুলেখা—ডাঃ রায়ের নিজস্ব চেম্বারে গিয়ে পেঁাছালে—ডাঃ রায় সুলেখাকে দেখেই বল্লেন—"মিস্ সামন্ত এসেছেন, ভালই হ'ল। এখন একটু কার্ত্তিকের ঠাণ্ডা পড়েছে, আর পূজোর-ছুটীতে একটু রোগীর ঝামেলাও কম। ধীরে-সুস্থে কাজ করা যাবে।" সুলেখা বল্ল—, "এখন আমাদের করণীয় কি? ডাঃ রায়—, আপনাদের আমার নারসিংহোমে অ্যাডমিশ্ন করিয়ে নিচ্ছি এবং আপনাকে একটা দলীল করতে হবে।" সুলেখা জ্যোতিকে বাইরে রোগী-বসার ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রেখে এসেছে। এবং ইচ্ছে করেই জ্যোতিকে বাইরে দূরে দূরে রাখছে যাতে ডাঃ রায় ও তার আলোচনা জ্যোতির কানে না যায়। যদি জ্যোতি আপত্তি তোলে! যাক্—সুলেখা একটা দলীল পত্রে লিখল—,

"আমি স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় এবং কাহার দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া সুস্থ মনে এবং সতঃস্ফূর্ত্তভাবে আমার ডান দিকের চক্ষুর cornea আমার স্বামী শ্রীজ্যোতি সামন্তের ডান চক্ষুতে cornea-grafting করিতে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করিতেছি। ইহা আমার একান্ত বাসনা ও ইচ্ছা, এবং আমার ডান চক্ষুর cornea, আমার স্বামীর ডান চক্ষুতে grafting করিলে আমি ডাঃ রায়ের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিব।" ইতি—

সুলেখা সামন্ত।

সেই সঙ্গে ডাঃ রায় ও আর দু-জন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাক্ষী স্বরূপ দলিল পত্রে সই করলেন।

পরদিন সুলেখাকে এবং জ্যোতিকে একই সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে পোষাক পালটে অপারেশন টেবিলে জ্যোতিকে

আগে তুলে অজ্ঞান করা হ'ল। এবং সুলেখাকেও তার পোষাক পাল্‌টে অপারেশন টেবিলে তুলে অজ্ঞান করা হ'ল। ডাঃ রায় ও তাঁর সহকারী আর ত্ব'জন ডাঃ সামন্ত ও ডাঃ ব্যানার্জ্জী এবং আর ত্বজন সাহায্যকারী নার্স কেবল অপারেশন রুমে থাকলেন। অপারেশনরুম হ'তে যখন দরজা খুলে ডাঃ রায় বেরুলেন—তখন প্রায় ত্ব ঘণ্টার উপর হয়ে গিয়েছে। সুলেখা—জ্যোতি অচৈতন্য। সুলেখা ও জ্যোতিকে বিশেষ যত্নে এবং বিশেষ-তত্ত্বাবধানে একটি আলোক-তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ত্বটি পাশপাশি বেডে রাখা হ'ল। সুলেখার ডানদিকের চোখে ব্যাণ্ডিজ এবং জ্যোতির ডানদিকের চোখে cornea-grafting করা হয়েছে, কাজেই জ্যোতিরও ডানদিকের চোখে ব্যাণ্ডিজ করা আছে। বিশু—সুলেখা-জ্যোতি কলকাতায় যাবার পাঁচ-দিনের দিন—ডাঃ রায়ের ঠিকানা ধরে তাঁর নারসিংহোমে গিয়ে হাজির। বিশু কিছু ফল নিয়ে গিয়ে সুলেখার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ভিজিটিং রুমে একজন নার্স এসে বল্লেন—, সুলেখা দেবীর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না। তিনি বেডে এবং এখনও তাঁর চোখ খোলা হয়নি।" বিশু—, "কি বল্‌ছেন—মা! আমার সুলেখা-মা কেন বেডে থাকবে? বেডে থাকবে জ্যোতি। নার্স একটু বিস্ময়ে বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—, "আপনি উনাদের কে হ'ন?" বিশু—, "কেন! আমি ওদের কাকা।" নার্স—, "তবে আপনি জানেন না—, সুলেখা দেবী তাঁর নিজের চোখ জ্যোতি বাবুকে দান করেছেন।" বিশু— আঁ্যৎকে উঠে, "হেইমা—আমার কি হবে? বল কি—নার্স দিদিমণি-মা! নিজের চোখ নিজে উপরে দিলে?" নার্স মেয়েটি একটু হেসে উত্তর দিলেন—, "নিজে কেন উপরাবেন—? ডাঃ বাবুরা উনার চোখের-মণি তুলে জ্যোতিবাবুর ডান চোখে বসিয়ে দিয়েছেন।" বিশু—, "তাহলে আমি দেখতে পাব না?" নার্স—, 'না, আরো ক'দিন বাদে, কথা বলতে বারণ আছে।" বিশু—, "তবে এই ফলগুলো

রাখ মা—!" নার্স—, "উনাদের কোন শক্ত জিনিষ খাওয়া নিষেধ আছে।" বিশু—, "তবে তুমি খেও মা। এই আমি চল্লাম। সর্বনাশী নিজের চোখটাও দিলি—।" আপন মনে বলতে বলতে বিশু যে-পথে এসেছিল সেই পথেই আবার ফিরে গেল। নার্স মেয়েটি অবাক হয়ে ফল কটার দিকে একবার টেবিলে তাকাচ্ছে আবার একবার বিশুর গমন পথের দিকে তাকাচ্ছে।

বিশু বাড়ী ফিরে এসে তার পরেরদিন ঢাকে-ঢোলে সব একাকার করে ফেল্ল। যেই জিজ্ঞাসা করে, জ্যোতি কেমন আছে? বিশু উত্তর দেয়—, "কি আর বলব, জ্যোতি চোখ কোথায় পাবে গা? সুলেখা মা আমার নিজের চোখ তুলে তাকে দান করেছে।" চায়ের দোকানী মদন মালী জিজ্ঞাসা করল, "সে আবার কি কথা? বিশুদা!" বিশু—, "হ্যাঁ, তাই কথা. ডাক্তারবাবুরা সুলেখার চোখ অপারেশন করে তুলে তবে সেই চোখ জ্যোতির চোখে দিয়েছে।" যে শোনে সেই অবাক হয়ে 'ধন্য-ধন্য' করে। কথাটা রাষ্ট্র হ'তে বেশী দেরী হ'ল না, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কথাটা যখন ডোমজুরে সুলেখার বড়দি চন্দ্রলেখার বাড়ী গিয়ে পৌঁছাল—চন্দ্রলেখার ছোট 'জা' অরুণের স্ত্রী মিনতি মন্তব্য করল—, "ধন্য সুলেখার ভালবাসা, ধন্য জ্যোতির স্ত্রী ভাগ্য। ওরা কত মহৎ।" কিন্তু কথা কটি যখন খড়ি ওপ্‌ গ্রামের মণিমোহন সরকারের বাড়ী গিয়ে পৌঁছাল! তখন সরকার বাড়ীতে কান্না-কাটি পড়ে গেল, বিশেষ করে সুলেখার মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। মণিমোহন প্রকাশ্যে কাঁদলেন না বটে তবুও চোখের জল আর সামলাতে পারছেন না। বার বার বাড়-বাড়ীতে গিয়ে আড়ালে অবডালে কাপড়ের খুট দিয়ে চোখ মুছছেন।

মণিমোহনবাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীকে তিরস্কারের সুরে বলতে লাগলেন—, "তুমি বাবা, তাই তুমি পাষাণ। কেমন করে আছ? আর কাকে নিয়ে থাকব? যাও দেখে এস, ডাকাত মেয়ে—আর কি করে বসে। কেমন আছে—আহা! এত জেদ্‌, এত অভিমান, লোকে

স্বামীকে অন্ধ বলবে তাই নিজের চোখ দিয়ে স্বামীর অন্ধত্ব—ঘোঁচাল। যাও তুমি যাও।" স্ত্রীর কথায় মণিমোহনবাবুর গলার স্বর কেঁপে উঠল, চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বল্লেন, "তুমি মা তাই তোমার একারই ব্যথা। আমি কি তাকে একটুও ভালবাসিনি ? আমি প্রশ্রয় না দিলে তার স্বাধীনতা কোথায় পেত ? তার এত জেদ্, আমি না চাইলে সে কি করে লেখা-পড়া শিখে স্বাবলম্বী হ'ত ? সরকার বাড়ীর মেয়ে'ত দূরের কথা, কোন পুরুষই কি এতটা লেখা-পড়া করেছে ? আমার কত সাধ ছিল—সুলেখা লেখা-পড়া শিখে কত বড় হবে।" স্ত্রী, "কেন সেকি বড় হয়নি ? তার লেখা-পড়া শেখা কি সার্থক হয়নি ? তার যোগ্যতা দিয়ে সমাজের একজন তথাকথিত অযোগ্যকে যোগ্যতর করে তুল্ল। চোখ দিয়ে তার অন্ধত্ব দূর করল, এটা কি কম কথা ? আর অভিমান করো না—যাও, ওদের দেখে এস।" মণিমোহন, "আমি যে কলকাতায় কোথায় অপারেশন করেছে জানি না।" স্ত্রী, "কেন ? জ্যোতির বাড়ী যাও। বিশু, বিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।" মণিমোহনবাবু নতশীরে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, আজ আর হ'ল না আগামীদিন রওনা দেব।"

এদিকে সুলেখা-জ্যোতির 'Eye-Cornea-Grafting-এর খবর কলকাতার একটি নামকরা দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে 'চক্ষু-দান' শিরনামে বাহির হইয়াছে।

"দেবী প্রতিমায় চক্ষুদান নয়, দেবী প্রতিমায় ব্রাহ্মণ তাঁর যজ্ঞ সূত্র ধরে বিশেষ মূহুর্তে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদি দানের পর বিশেষ মন্ত্রে বিল্বপত্রের কজ্জলে চক্ষুদান করেন। এ দান সে দান নহে। এ দান মহাদান। যা আজ পর্য্যন্ত কেউ করেন নি, বা করতে পারেন নি। সুলেখা দেবী, অর্থাৎ সুলেখা সামন্ত তাঁর দৃষ্টিহীন স্বামীর দুই চক্ষুর মধ্যে তাঁর ডান চক্ষুর (Eye-Ball) মণি তুলে তাঁর স্বামী জ্যোতি সামন্তের ডান চক্ষুতে cornea grafting করাইলেন।

এই মহাদানের প্রধান পুরহিত ছিলেন—ডাঃ রায়। ডাঃ রায়, তাঁর নিজস্ব নারসিং-হোমে এই চক্ষুদান যজ্ঞ সম্পন্ন করান। আমরা ডাঃ রায়কে ধন্যবাদ জানাই তাঁর এই অসম সাহসীক কাজের জন্য। আর সুলেখাদেবীকেও আমাদের অজস্র ধন্যবাদ তাঁর এই মহতী দানের জন্য। যা ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। মৃত্যুর পর অনেকেই তার চক্ষুদানের ইঙ্গিত দিয়ে যান, কিন্তু জীবিত অবস্থায় কোন নারী বা পুরুষ তাঁর দৃষ্টিহীন স্বামী বা স্ত্রীর চক্ষুতে নিজের চোখের পরশ পাথর তুলে স্বামীকে বা স্ত্রীকে দান করে দুনিয়ার আলো ভাগ করে নেন্‌নি। এই বিরল, অভূতপূর্ব মহাদানের জন্য ধন্য সুলেখাদেবীর জীবন, সার্থক জ্যোতিবাবুর স্ত্রী ভাগ্য। ধন্য নারী সমাজ। আমরা জ্যোতি সুলেখার অমর-প্রেমকে অমর করে রাখার জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি।"

পেপারে 'চক্ষু-দান' শিরনামে এই কাহিনী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই খবর যখন খড়িওপ্‌ গ্রামের সরকার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছাল, তখন সরকার বাড়ীর বার বাড়ীতে খবরের কাগজে সুলেখা-জ্যোতির ছবিসহ তাদের 'চক্ষু-দান' নিবন্ধে গ্রামের আর পাঁচজনের নজর। সবাই কাগজ নিয়ে—"আমি দেখি, আমি দেখি" করে কাড়াকাড়ি করছে তখন মণিমোহনবাবু খবরের কাগজটা অন্যের হাত হতে নিয়ে বল্লেন—"ওরে আমায় একটু দেখতে দে।" মুখ বুজে একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিতে তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। কোন রকমে পেপারটায় চোখ দুটো বুলিয়ে চোখ দুটো মুছতে মুছতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভিতর বাড়ীতে উঠে গেলেন।

এদিকে যেদিন সুলেখার-জ্যোতির চোখ অপারেশন হয়েছে—সেইদিন—ডাঃ রায় ওদের জ্ঞান ফেরার আগেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বল্লেন—, "ওদের দু-জনকে দুটো আলাদা আলাদা অন্ধকার ঘরে ভিন্ন-ভিন্ন বেডে রাখতে হবে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী, এক ঘরে থাকলে কথা বলবে। আর একমাত্র আমরা ছাড়া অন্য কেউ যেন ঐ ঘরে না যান। এবং কথা বলা একদম বারণ থাকল। কোন

বাইরের খাবার খাবেন না। ঠিক দশদিনের দিন চোখ খোলা হবে।" এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে নার্স দিদিমনিরা পালন করতে লাগলেন।

এদিকে দেখতে দেখতে সুলেখা-জ্যোতির অপারেশন ন-দিন পার হয়ে গিয়েছে। মণিমোহণ পরেরদিন সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে সকাল ছ'টার মধ্যে জ্যোতির বাড়ী এসে হাজির। বিশু হঠাৎ মণিমোহন সরকারকে দেখে আঁৎকে উঠল, কি জানি এবার আমায় কিছু না বলে। আমি'ত কিছু জানি না, আর সুলেখা-মা অন্যায় বা কি করেছে?" এমন সময় মণিমোহনবাবু বিশুর সন্মুখে এসে বল্লেন—, "বিশু, তুমি সুলেখা-জ্যোতি কলকাতায় কোথায় আছে জান?" বিশু—, "আজ্ঞে দাদা জানি বৈকি! আমি পাঁচদিনের দিন দেখতে গিয়েছিলাম; আমায় দেখতে দিল না। নার্স-দিদিমনি-মা বল্লেন—এখন কথা বলা ও দেখা করা বারণ আছে। দশদিনের দিন চোখ খুলবে—তখন যদি দেখা হয়।" মণিমোহন—, "আজ ক'দিন হল?" বিশু, "আজই ত দশদিন হ'ল।" মণিমোহন, "তবে চল যাই দেখে আসি।" বিশু বিস্ময়ে মণিমোহনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল—, "আপনি, আপনি যাবেন দাদা?" মণিমোহন—, "কেন আমার যেতে বারণ আছে?" বিশু—, "না-না দাদা! তাই বলছিলাম।" মণিমোহন—, "কেন আমি কি তাদের বাবা নই? আমার কি কোন ব্যথা নেই?" বিশু—, "না-না দাদা! তাই কি হয়? তা কখন যাবেন?" মণিমোহন—, "আজ এক্ষুণি তৈরী হও।" বিশু কোন রকমে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে ঘর-দোর বন্ধ করে ঘরে তালা-চাবি দিয়ে তৈরি হয়ে উভয়ে কলকতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে সুলেখা জ্যোতির আজ দশদিনের দিন চোখ খুলবে। জ্যোতি আজ প্রথম আবার তুনিয়ার আলো দেখবে। তাই জ্যোতির একান্ত অনুরোধ সে প্রথমে চোখ খুলে তার লেখাকে দেখবে—, তার লেখা কেমন দেখতে। তার মনের রূপের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। ডাঃ রায় তাতেই রাজী হ'লেন। ঠিক হ'ল আজ খাওয়া-দাওয়ার পর

বিশ্রাম নিয়ে বিকালে সুলেখা-জ্যোতি একই ঘরে তারা দু-জন দু-জনকে চিনে নেবে ; দেখবে নয়ন ভরে। এদিকে বিশু মণিমোহন ঠিক দুপুরের একটু পরে ডাঃ রায়ের নারসিং হোমে এসে হাজির। মণিমোহনবাবু দিদিমণিদের পরিচয় দিলেন—, "আমি সুলেখার বাবা, আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।" নার্স—, "আপনারা এই ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করুন। এখনো উনাদের চোখ খোলা হয়নি, তবে আজই একটু পরে।" মণিমোহন ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—, "সুলেখা-মার আমার কোন ক্ষতি হয়নি'ত ?" নার্স—, "না না, শুধু সুলেখাদেবীর ডানদিকের চোখের cornea-টা তুলে জ্যোতিবাবুর ডানদিকের চোখে grafting করে দেওয়া হয়েছে।" মণিমোহন "সেই চোখে দেখতে পাবে' ত মা !" নার্স—, "হ্যাঁ নিশ্চয়, আর সেইজন্যেই ত এত কাণ্ড করা।"

তবুও মণিমোহন ভেঙ্গে পড়লেন—, চোখের জল আর কিছুতে ধরে রাখতে পারছেন না। এমন সময় বিশু—মণিমোহনবাবুকে বল্ল—, "দাদা—, তুমি ত ভাগ্যবান !" মণিমোহন আমার মেয়ে তার চোখ তুলে দিল, আর আমি হ'লাম ভাগ্যবান ?" বিশু—, "নিশ্চয় ! এমন ভাগ্য ক'জনের হয় ? কার মেয়ে এমন দান করতে পারে ? তুমি রামায়ণ মহাভারত পড় আর তুমি জান না ? আমাদের ত চোখ থাকতি কানা, আর তোমরা চোখ থাকতি দেখনা দাদা ! দেখ জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধার দেশের রাজা (বর্তমানে কাবুলদেশ) গান্ধার তাঁর রাজকন্যা গান্ধারীকে দান করেননি ? তিনি' ত মহারাজা ছিলেন। রাজপুত্র বড় হলি কি হয়, রাজসিংহাসন'ত পান নি, তবুও সেই জন্মান্ধ রাজপুত্রকে তিনি কন্যাদান করেছিলেন। গান্ধারী মহাসতী ছিলেন, স্বামীঅন্ত প্রাণ ছিল। স্বামীর দুঃখে তিনি পতিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য স্বামীর ঘরে আমরণ চোখ বেঁধে রেখেছিলেন। চোখের আলোয় আর দুনিয়া দেখেন নি, কিন্তু তবুও চক্ষুদান করতি আর পারেন নি—আর তোমার মেয়ে কিনা তোমাদেরই পাল্টা ঘর, তোমার বাল্য বন্ধুপুত্র জ্যোতিকে

অন্ধ বলে তোমরা কেউ খোঁজ পর্য্যন্ত নাওনি ; আর সুলেখা-মা আমার কত বড়, ওকে কত অবহেলার অন্ধকারের ভেতর হ'তে তাকে তুলে তার আঁধার চোখে আলো দিল। একি কম কথা ? আজ যে যতই দান করুক, এমন দান কে করতি পেরেছে ? গান্ধারী পারেন নি, আর তাই তোমার মেয়ে করল ! এরজন্য তোমার ধন্য হওয়া উচিৎ।" মণিমোহন আবেগে বিশুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—, "বিশু তোকে মূর্খ বলে, ছোট বলে কত অবজ্ঞা করেছি, তোর যে চোখ আছে—আমার সেই চোখও নেই। আমি অহংঙ্কারে অন্ধ ছিলাম। আমার অহংঙ্কার আজ চূর্ণ হ'ল। তুই শুধু ঘাটের মাঝি নোস্—, আমার চেতনার মাঝিও বটে। আমার চোখ ফোটালি ; তুই আমার মিথ্যা অর্থের, মানের, বংশ-মর্য্যদার অহংঙ্কার আজ চূর্ণ করে আমার চোখেও সত্যের আলো দিলি ! আয় ভাই তোকে কত ছোট বলে অবজ্ঞা করেছি, কত নিচ্ বলে অশ্রদ্ধা করেছি, আমায় ক্ষমা কর !" বিশু—"কি যে বলছ দাদা ! আমি ছোট ছোটই আছি। আমি কি তোমাদের উপর উঠতি পারি ? দেখনা— ! বলিরাজা যত অহংঙ্কারী হোক তবুও মাথাটা পেতে দিয়ে নিজেকে ধন্য করেছিল। স্বয়ং নারায়ণ বলি-রাজের অহংঙ্কার চূর্ণ করতি এসে তাঁকে ধন্য করেছেন। এমন ভাগ্য ক'জনের হয় ! তুমি এমন মেয়ের বাপ হয়ে কত ধন্য বলত ?"

এদিকে ঠিক হ'ল আজ জ্যোতি প্রথম চোখ খুলে তার লেখাকে দেখবে। ডাঃ রায় সেই মতই ব্যবস্থা করেছেন। ঠিক বেলা চার টার সময় সুলেখা জ্যোতির বেডে এসে বসেছে। ঘরটা সুন্দর করে সাজান হয়েছে ! টেবিলে একতোড়া রজনীগন্ধার ঝাড় একটা ফুলদানীতে। একজন নার্স এসে একটা নীল আলোর লাইট জেলে উজ্জ্বল লাইটটা নিভিয়ে আস্তে আস্তে জ্যোতির ডান চোখের ব্যাণ্ডেজটা খুলে দিলেন। ডাঃ রায় অধীর আগ্রহে পর্দার আড়ালে বসে লক্ষ করছেন তার cornea-grafting কতদূর successful হ'ল। তিনি ইতিপূর্বে অনেক cornea-grafting করেছেন বটে তবে জল-জ্যান্ত

একজনের চোখ হ'তে cornea আর একজনের চোখে set করা এটাই তাঁর জীবনে প্রথম। জ্যোতি চোখে আলো পেলে তাঁরও কম আনন্দ নয়। তাই তিনিও পর্দার আড়ালে অধীর আগ্রহে মূহুর্ত গুনছেন।

নার্স জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করছেন—, "জ্যোতিবাবু! কিছু দেখতে পাচ্ছেন?" জ্যোতি—, "হ্যাঁ!" নার্স—, "কি দেখছেন?" জ্যোতি—, "আপনাকে আর এই ভদ্রমহিলাকে।" নার্স—. "কেন আপনার স্ত্রী সুলেখাদেবীকে দেখতে পাচ্ছেন না?" জ্যোতি—, "কই না'ত!" নার্স—, "আপনার স্ত্রী সুলেখাদেবীকে চেনেন না?" জ্যোতি—, "চিনি, তাকে তার গলার স্বরে চিনি, তাকে স্পর্শে চিনি। তাকে ত কখনও দেখিনি।" তখন সুলেখা একটু হেসে একটু এগিয়ে এসে জ্যোতির হাতখানা নিয়ে হাত বোলাতে লাগল। জ্যোতি—চোম্‌কে উঠে আবেগে বলে উঠল—, "তুমি! তুমি আমার লেখা? তুমি এত সুন্দর, কই কথা বলছ না কেন?" সুলেখা জ্যোতির হাতে হাত বোলাতে বোলাতে উত্তর দিল, "আস্তে, বেশী কথা বলতে নেই। ডাক্তারবাবুর বারণ আছে। আস্তে কথা বল!" জ্যোতি—, "আচ্ছা তোমার ঐ চোখটায় ব্যাণ্ডেজ কেন?" নার্স—, "উনিই ত উনার ডান চোখের মণি অপারেশন করে তুলে দিলে তবে আপনার চোখে সেট্ করে তবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন!" জ্যোতি আবেগের সুরে বল্ল—, "লেখা! এ তুমি আমায় না বলে কি করলে?" সুলেখা হাতে হাত বোলাতে বোলাতে আস্তে আস্তে উত্তর দিল—, "তাছাড়া'ত আর কোন উপায় ছিল না, তাই আমার চোখ তোমায় দিলাম। আমার দুটো চোখ থাকবে আর তোমার একটাও থাকবে না?" জ্যোতি আবেগে সুলেখাকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগল—, "লেখা! তুমি শুধু সুন্দর নও, তুমি কত মহৎ! আমি তোমার চোখ দিয়ে আজ তোমায় দেখলাম। নতুবা আমার এজনমে ক্ষমতাও হ'ত না তোমায় দেখা, তোমায় জানা, তুমি কত বড়! আমি কত জনমে তোমার এ ঋণ শোধ করব লেখা!

সুলেখা জ্যোতির পিঠে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে উত্তর দিল—, "ঋণ নয়, জন্মে জন্মে তোমায় বেঁধে রাখলাম আমার আলোয়, আমার ভালবাসায়।"

ডাঃ রায় খুশির আনন্দে বাইরে গিয়ে সুলেখার বাবার হাতখানা চেপে ধরে ঝাকিয়ে বল্লেন—, "ধন্য আপনি, এমন মেয়ের পিতা হয়ে। আজ আমিও ধন্য হলাম এমন একজন মহান প্রেমিকার স্বামীর চোখে আলো দিতে পেরে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।

—: সমাপ্ত :—